

এবং প্রান্তিক

An International Research Referred Journal

DIIF Approved Impact Factor : 1.12

Issue 2nd Vol. 7th September, 2015

সম্পাদক

আশিস রায়

E:\ebong prantik logo.tif

EBONG PRANTIK

Ebong Prantik

An International Research Referred Journal

Editorial Board

**Executive Editor**- Prof.Bratati Chakravarty.

**Editor-** Ashis Roy.

**Co-Editor**-Tumpa Bapari, Asish Kr.Sau, Sujay Sarkar.

**Advisory Board** – Subal Kumar Maity, Bibhabasu Dutta, Biswajit Karmakar, Soma Mukherjee, Akash Biswas, Jayanta Mandal Suvojit Dutta, Tapaskumar Sardar, Mrinmoy Paramanik, Md.Intaj Ali, Mohankumar Mayra.

**Expert Members**-

Dr.Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)

Dr.Achinta Chatterjee (California University)

Dr.Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)

Dr.Manas Majumdar (Calcutta University)

Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)

Dr.Sambhunath Bandyopadhyay (Burdwan University)

Dr.Tania Hossain (Waseda University)

Dr.Soumitra Shekhar (Dhaka University)

Dr.Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)

Dr.Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)

Dr.Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)

Dr.Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)

Dr.Samaresh Debnath (Dhaka University)

Dr.Bhuina Iqbal (Chattagram University)

প্রচ্ছদ শিল্পী- আরাধনা দাস।

\* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

সূচীপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| হেলাল হাফিজের কবিতা/মামুন রশীদ | ১-১০ |
| দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : উৎস থেকে উজানে/ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায় | ১১-২৫ |
| লোকসংস্কৃতি ও বৌদ্ধ জাতক/মৌসুমী চক্রবর্তী | ২৬-২৯ |
| **পিতৃতন্ত্র ও বাম-রাজনীতি : মণিকুন্তলা সেনের আত্মকথার একটি নারীবাদী পাঠ**/**উষসী চক্রবর্তী** | ৩০-৩৭ |
| জীবনানন্দ দাশ কবিতার সত্য ও সময়ের সত্য/তরুণকুমার মৃধা | ৩৮-৪৩ |
| পত্র-সাহিত্য : কী, কেন কিন্তু আর কতকাল ?/ড. আকাশ বিশ্বাস | ৪৪-৪৯ |
| সেকালের নিগড় ও একালের প্রতিশ্রুতি : ‘গণদেবতা’য় গণচেতনার নির্মিতি/ নেহা চট্টোপাধ্যায় | ৫০-৬৮ |
| ভারতের জাতীয় ভাষা কোই/রমজান আলী | ৬৯-৭৩ |
| মানিকদত্ত ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল : প্রসঙ্গ তুলনামূলক আলোচনা/ গৌতম মণ্ডল | ৭৪-৮২ |
| সৃষ্টিই স্রষ্টার মৌলিকতার বাহক : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল/জয়ন্ত মণ্ডল | ৮৩-৯৯ |
| দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য /  টুম্পা ব্যাপারী | ১০০-১০৪ |
| ঘটি-বাঙাল সমস্যা ও সমরেশ মজুমদারের কয়েকটি উপন্যাস/সঞ্জীবন মণ্ডল | ১০৫-১১৯ |
| **বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই : সাম্প্রতিক কালের বাংলা আখ্যান**/  **অনুপম সরকার** | ১২০-১২৯ |
| **রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা : রং তুলি নক্‌সিকাঁথা**/**ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়** | ১৩০-১৩৪ |
| হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়েঃ ইতিহাস, ছদ্ম-ইতিহাস, কল্পনা ও রোমান্সের আখ্যান/ চন্দন বারিক | ১৩৫-১৪৮ |
| দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মশাল’ নাটকে সাম্প্রদায়িকতা ও শান্তি প্রসঙ্গ/আশিস রায় | ১৪৯-১৫২ |
| TIBETAN BUDDHISTS AND THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT/ Dr.Malvika Ranjan | 153-160 |
| HUNGERS IN BHABANI BHATTACHARYA’S NOVEL ‘SO MANY HUNGERS’/Amit Kumar De | 161-167 |

সম্পাদকীয়

ধারণাটা অনেকের মধ্যে আছে। আবার বেশিরভাগ গবেষক ভাবেন এটাই ঠিক। মিশ্রণটা যতটা ভালো করা যাবে প্রস্তুত হওয়া বিষয়টা ততটাই ভালো হতে পারে। এই মিশ্রণ নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। নির্ধারিত একটি বিষয়কে রেখে তার সঙ্গে কেউ কেউ সামান্য অন্যান্য বিষয়ের মিশ্রণ করেন। আবার অনেকে নির্ধারিত বিষয়কে ধরে একাধিক অন্যান্য বিষয়ের অগাধ মিশ্রণ করানোর চেষ্টা করেন। গবেষক হিসাবে দায়বদ্ধতা থেকে একটা নতুন কিছুর রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিবৃত্ত রাখেন আর এর ফলে মিশ্রণের সংজ্ঞা প্রত্যেকের কাছে বিভিন্ন রকম। গবেষকরা উদ্ধৃতির লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও একাধিক নিয়মের ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেকেই এর ধার দিয়েও যাওয়ার চেষ্টা করেন না। কিন্তু মিশ্রণটা করে যান। গবেষণাধর্মী একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। যিনি যেমন ভাবে ভাবছেন তিনি তেমন ভাবেই বিষয়টিকে রূপদানের চেষ্টা করেন।

এসব বিতর্কের মধ্যেও প্রাবন্ধিকরা তাদের বিষয় নির্বাচন ও লেখনিতে তাদের নিজস্বতা বজায় রাখেন।

হেলাল হাফিজের কবিতা

মামুন রশীদ

সাংবাদিক, দৈনিক মানদ কন্ঠ

বাংলাদেশ, ঢাকা

সবকিছুই আমরা একটি নিয়মের মাঝে ফেলে বিচার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, এতে করে আমাদের দেখার যে সীমাবদ্ধতা, তা প্রাথমিকভাবে ঢেকে ফেলা যায়। একটা নির্ধারিত ছকে বাঁধা নিয়মের মাঝে ফেলতে পারলে— আমাদের ভাবনা আরাম বোধ করে। আমাদের চিন্তা স্বস্তি ফেলে। মনে হয়— যাক, বিষয়টির একটি গতি হলো। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কারণ বড় পরিসরে ফেলে হিসেব করতে গেলেই তালগোল পাকিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আর তাতে করে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে আমাদের দৈন্যতা। সাহিত্যে দশক বিভাজনের যে ধারা— তার স্বীকৃতি সবখানেই। এটাও একটা নির্ধারিত সময়কে একটি নিয়মের বাঁধনে না হলেও একটি ছকে ফেলে বিচার, যা করা হয় সাধারণত দেখার সুবিধার জন্যই। এতে করে একদিকে নির্ধারিত সময়কে চিহ্নিত করা যায়, আবার সেই সময়পর্বের ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা সাহিত্যিককেও চিনে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে তার ক্ষেত্র যে সীমিত, এ অস্বীকার করার উপায় নেই। সীমাবদ্ধতার ভেতর থেকেই আমরা চেষ্টা করি বৃহেতর। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম না। আমাদের সাহিত্যেও দশক বিভজানের রেওয়াজ বেশ গুরুত্ব দিয়েই বিবেচিত। বিশেষত বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে— এই বিভাজনের রেওয়াজ পাকপোক্তভাবেই স্থান করে নিয়েছে। একটি দশকে অনেকে মিলেই বিচ্ছিন্নতার ভেতর থেকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। আর এই বিচ্ছিন্নতাকে যখন মিলিয়ে দেয়া হয় অনেকের সঙ্গে, তখন তা থেকে তৈরি হয় একটি স্বতন্ত্র স্বর। যার মাধ্যমে সেই দশক বা সময়কে চিনে নেয়া সম্ভব হয়। অর্থাত্ অসংখ্য গৌন, অগৌণ আর প্রধান বা অন্যতম কবির সমন্বয়ে একটি সময়ের পরিপূর্ণ ছবি আমরা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। আবার এর বিপরীত দৃশ্যও রয়েছে। শুধু একজন কবিই তার কবিতা দিয়ে চিনিয়ে দিতে পারেন নিজের পুরো সময়। বাংলাদেশের কবিতায় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে তুমুল পরিবর্তনের ঢেউ, যার সর্বশেষ ধাপ— মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা, স্বাধীন বাংলাদেশ। সেই সময়ের ছাপ— ষাটের দশকের সাহিত্যে রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আর এ দশকের কবিতাও তার ব্যতিক্রম না। কবিরা সময়কে ধারণ করেই কবিতা রচনা করেন। তাই ষাটের দশকের কবিতায় উঠে এসেছে সেই সময়ের বাংলাদেশ, সেই সময়ের মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সেই সময়ের আবহ। হেলাল হাফিজ এই সময়ের কবি। নেত্রকোনা জেলায় ৭ অক্টোবর, ১৯৪৮ সালে জন্ম নেয়া এই কবির কাব্যগ্রন্থ মাত্র দুটি। যে জলে আগুন জ্বলে এবং কবিতা ৭১। বাংলাদেশের কবিতায় ষাটের দশকের কবিদের মাঝে বহুপ্রজ কবি যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন স্বল্পজ কবিও। ষাটের দশকের অনেকেই খুব অল্প লিখেছেন। মাত্র একটি বা দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই, অনেক কবি আর কবিতার সংসারে থাকেননি। ষাটের উচ্চকণ্ঠের কবিতার ভুবনে— নম্র সুরের অনেকের কবিতাই চাপা পড়ে গেছে। সময়কে তীব্রভাবে স্পষ্ট না করে, না ধরে নম্রকণ্ঠের অনেকেই যেমন এড়িয়ে গেছেন। তেমনিভাবে একসময় তারা কবিতাকে বিদায়ও জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠের অথবা নম্রকণ্ঠের যাই বলি না কেন, বাংলাদেশের কবিতায় ষাটের দশকের স্বল্পপ্রজ কবিদের মাঝেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হেলাল হাফিজ। তার প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ পায় বিশ শতকের আশির দশকে। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তার ‘যে জলে আগুন জ্বলে’ শিরোনামের কাব্যগ্রন্থটিতে কবিতার সংখ্যা মাত্র ৫৮টি। এরপর এই কবিতার বইটির অসংখ্য সংস্করণ হয়েছে। প্রতি বছর নতুন কবিতার বই না হলেও এই একই বই নতুন নতুন সংস্করণ হয়ে পাঠকের হাতে হাতে ফিরেছে। শুধু হাতে হাতে ফেরা বললে ভুল বলা হবে, বরং বলা যায় কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলো একইসঙ্গে পাঠকের মুখে মুখেও ফিরেছে। কাব্যগ্রন্থের পংক্তির পর পংক্তি যেমন পাঠকের কণ্ঠ ধারণ করেছে, তেমনি কয়েকটি পংক্তি দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগান হয়েও ফিরেছে। কবিতা শ্লোগান হলেও তার আবেদন কমেনি এতটুকুও। বরং শ্লোগান হয়ে, দেয়ালের গায়ে শোভা পেয়ে তা আরো উদ্ভাসিত হয়েছে। সেইসঙ্গে মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থে, মাত্র ৫৮টি কবিতা লিখে ষাটের দশকের কবি হেলাল হাফিজ অর্জন করেছেন ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা। অবশ্য প্রথম বই প্রকাশের পরই, ষাটের অল্পপ্রজ কবিদের অন্য অনেকের মতো তিনিও অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে পড়েন কবিতা বিষয়ে। ‘যে জলে আগুন জ্বলে’ বইটি প্রকাশের ২৬ বছর পর ২০১২ সালে প্রকাশ পায় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ‘কবিতা একাত্তর’ শিরোনামের বইটিকে মূলত আগের বইয়েরই ভিন্ন সংস্করণও বলা চলে। দ্বিভাষিক বইটিতে আগের সব কবিতাই রয়েছে, রয়েছে সেগুলোর ইংরেজি অনুবাদ, সঙ্গে কয়েকটি নতুন কবিতা।

কবি— তার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন কবিতা। যে কবিতায় রয়েছে পাঠককে ভাবানোর খোরাক, যে কবিতায় রয়েছে নিজেকে খুঁজে পাবার সিঁড়ি, যে কবিতায় রয়েছে সমাজ, সময় ও সমকালকে ধরে তুলে আনা জীবনের নির্যাস, তাকেই বারবার পাঠক পাঠ করে। সেই কবিতা পাঠেই তৃপ্তি অনুভব করে পাঠক। কারণ কবিতা মানুষের স্মৃতিকে যেমন নাড়া দেয়, তেমনি ভাবে ভাবনাকে উস্কে দেয় আগামীর দিকেও। হেলাল হাফিজের কবিতা— পাঠককে সেই আনন্দ দেয়। ফলে দীর্ঘ ২৮ বছর পরে এসেও, পাঠক নিজেকে খুেঁজ পায় নিজেকে। আর তাই প্রতিবছরই তার একটি মাত্র কবিতার বইয়ের নতুন সংস্করণ হয়। পাঠক প্রতিবারই নতুন করে নিজেকে আবিস্কার করে। ফলে হেলাল হাফিজও নতুনের সঙ্গে, নতুন কবিতার সঙ্গে যুক্ত হন। সময়কে ছাপিয়ে যখন কবিতা অন্য সময়েও নিজেকে পাঠকের রুচিকে নাড়াতে পারে তখনই তা সত্যিকার অর্থে ভালো কবিতা হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে তিনি সফলতম বলেই বিবেচিত হবেন। তিনি কবিতায় যে সংবদেনশীলতা, আবগের যে পরিমিত বোধ, শব্দের সঙ্গে শব্দের সেতুবন্ধনে যে পারস্পরিক সংযোগ এবং বুদ্ধির সঙ্গে যুক্তির যে যোগসূত্র তৈরি করেছেন তাই তাকে প্রতিনিয়ত নতুন কবির কাতারে হাজির করছে। ফলে হেলাল হাফিজ হয়ে উঠেছেন একইসঙ্গে সমসাময়িক। একজন প্রেমিক মাত্রই বিপ্লবী, প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ— নিয়ম মেনে, সময়কে স্বীকার করেই। আর এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে যখন একজন কবি, মানবিকবোধের জায়গা থেকে নিজের প্রকাশভঙ্গিকে আধুনিক মানুষের রুচির সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করেন, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনের সঙ্গে শিল্পের যে সংযোগ, সেই সেতুকে ধরতে পারে। হেলাল হাফিজ শিল্পের এই সেতু নির্মাণে নিজের দক্ষতার প্রমান দিয়েছেন। আর এই প্রমানের মাধ্যমেই তিনি হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়

এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়

মিছিলের সব হাত

কণ্ঠ

পা এক নয় ।

সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,

কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার ।

কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার

শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে

অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে

অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে,

কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয় ।

যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান

তাই হয়ে যান

উত্কৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায় ।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়

এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় ।

(নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়)

পরিচিত শব্দের মাঝে নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন হেলাল হাফিজ। এই প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন নি। বরং পাঠকের মনোযোগ তার দিকে বারবার ঘুরে ফিরে স্থির হয়েছে, তার সাধারণত্বের কারণেই। কবিতাকে তিনি যেমন খুব দীর্ঘ করতে যাননি, তেমনি জটিলও করেননি। কবিতায় তিনি যে ছবি এঁকেছেন সেই ছবি আমাদের প্রতিদিনের দেখা ছবি। যে অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেছেন, তা আমাদের জানা অভিজ্ঞতা। তবু সাধারণের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো— তিনি অভিজ্ঞতাকে শুধু অভিজ্ঞান থেকেই বর্ণনা করেননি, বরং এর সঙ্গে যুক্তি, বুদ্ধিকেও যুক্ত করেছেন। তাতে করে একই বিষয়ের নতুন মাত্রা পেয়েছে তার কবিতা। বিষয় এবং প্রকরণের তিনি আমাদের জানা নিয়মের মাঝে থেকেও তাই হয়ে উঠেছেন আলাদা। ফলে তার কবিতা গতি হারায় নি, পথ হারায় নি। তাই বারবার তিনি পুনমুদ্রিত হন। কবিতার বিষয়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং প্রকৃতিকে তিনি প্রাধান্য দিলেও সমাজ, রাজনীতি, জীবন সেখানে উহ্য থাকেনি। ফলে একই সঙ্গে তার কবিতায় উঠে এসেছে রাজনীতি, সমকাল আবার সেইসঙ্গে জীবন এবং জীবনের নানা জটিলতা। তিনি যেমন কবিতায় স্মৃতি হাতড়ে ফিরেছেন আবার তেমনি নির্মাণ করেছেন কল্পনা ও ভবিষ্যতের ইমরাত। ফলে চেনা দৃশ্যের মাঝে পাঠক বিষয়ের বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছে তার কবিতায়। যা তাকে পুর্নপাঠে বাধ্য করেছে, যা তার কবিতাকে করে তুলেছে স্মরণীয়। ‘স্মরণীয় পংক্তি মাত্রই কবিতা’ বাক্যকে যদি আমরা স্থির ধরি, তাহলেও বিশ ষাটের দশকের বাংলা কবিতার ভুবনে তিনি তুলনারহিত।

ইচ্ছে ছিলো তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাাজ্য বাড়াবো

ইচ্ছে ছিলো তোমাকেই সুখের পতাকা করে

শান্তির কপোত করে হূদয়ে উড়াবো।

ইচ্ছে ছিলো সুনিপূণ মেকআপ-ম্যানের মতো

সূর্যালোকে কেবল সাজাবো তিমিরের সারাবেলা

পৌরুষের প্রেম দিয়ে তোমাকে বাজাবো, আহা তুমুল বাজাবো।

ইচ্ছে ছিলো নদীর বক্ষ থেকে জলে জলে শব্দ তুলে

রাখবো তোমার লাজুক চঞ্চুতে,

জন্মাবধি আমার শীতল চোখ

তাপ নেবে তোমার দু’চোখে।

ইচ্ছে ছিল রাজা হবো

তোমাকে সাম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো,

আজ দেখি রাজ্য আছে

রাজা আছে

ইচ্ছে আছে,

শুধু তুমি অন্য ঘরে। (ইচ্ছে ছিলো)

হেলাল হাফিজের কবিতায় বারেবারে ঘুরে ফিরে এসেছে ব্যক্তিমানুষের মানবিক বিপর্যয়, প্রেম, দুঃখের অনুভূতি আর হাহাকার। পুরো ষাটের দশক জুড়েই যে অস্থিরতা, এমনকি স্বাধীনতার পর, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে যখন মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করবে প্রাণ ভরে, সেই ইচ্ছে সফল হয়নি। বরং বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর থেকে পরস্পরের ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া, রাজনৈতিক জীবনে হতাশা, ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাসহীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইতিহাসের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারকে রক্তাক্ত অধ্যায়ের মাধ্যমে বিদায়, স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির পরাজয়, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির উত্থান এবং সেইসঙ্গে একের পর এক সামারিক সরকারের উত্থানেও ভেঙ্গে পড়ছিল সামাজিক শৃঙ্খল। হতাশা, অপ্রাপ্তি এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বেদনাহত মানুষ ক্রমশ নিঃষঙ্গ হয়ে উঠছিল। নিজের ভেতরেই তারা নির্মাণ করে নিচ্ছিল আলাদা ভুবন। পুরো ষাটের দশক জুড়ে রয়েছে এর প্রভাব। ষাটের দশকের কবিতায় প্রেম আছে, প্রেমের প্রকাশ আছে, তবে সেই প্রেমে নেই প্রাপ্তির সুর। বরং যে হতাশা, দুঃখবোধ এবং না পাওয়ার বেদনা হাহাকার হয়ে ধ্বনিত হয় ষাটের দশকের কবিতায়। হেলাল হাফিজের কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। তার কবিতাতেও প্রেমে প্রাপ্তির সুর নেই। নেই মিলনের আনন্দ।

হেলাল হাফিজের কবিতা জীবনের কথা বলে। তিনি কবিতায় তুলে আনেন জীবনকে। ফলে তার কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় মানুষ। তিনি যখন বলেন—

নিউট্রন বোমা বোঝ

মানুষ বোঝ না ! (অশ্লীল সভ্যতা)

তখন মানুষের প্রতি তার দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিকতার বড় অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জীবনযন্ত্রণা, যন্ত্রণাকাতর জীবনের অনুভূতি। আধুনিকতায় ব্যক্তি মানুষের সংকটকেই বড় করে দেখানো হয়। ষাটের দশকের কাব্যচর্চা শুরু করলেও হেলাল হাফিজের প্রথম বই প্রকাশিত হয় আশির দশকে। সেইসঙ্গে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রথম কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছে আশির দশকে। সে অর্থে কি তিনি আশির দশকের কবি? এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায়, হেলাল হাফিজের কবিতা কোন দশকের কালবিচারে আটকে নেই। তিনি অনেক আগেই দশক পেরিয়ে গেছেন। দশক উত্তীর্ণ কবির তালিকায় স্থান করে তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বার্থেই সমসাময়িক। সত্তরের দশকের শুরুতে আমাদের বড় প্রাপ্তি স্বাধীনতা। কিন্তু এই দশকেই আমাদের জাতীয় জীবনে নেমে আসে কালো মেঘ। সেই মেঘ পুরো সত্তরের দশক আমাদের ঘিরে রাখে, আশির দশকের শুরুতে এই মেঘ আমাদের রাজনৈতিক পটভূমিতে ক্ষমতার পট পরিবর্তনে যোগ করে আরো একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। নেমে আসে আরো একটি সামরিক শাসন। ফলে জাতীয় জীবনের সংকট দীর্ঘমেয়াদী হয়, মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অনির্দিষ্ট কালের জন্য রোধ হয়। এরকম পরিস্থিতিতে যখন মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখছে, কালো মেঘ সরিয়ে মুক্তির স্বাদ খুঁজছে, স্বাধীনতার সেই রক্তবর্ণ গৌরবের তিলক ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাইছে, সেই সময়— অস্থিরতার সেই শীর্ষ সময়ে রচিত হয়েছে হেলাল হাফিজের অধিকাংশ কবিতা। যেখানে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন হূদয়কে। যেখানে তিনি হূদয় খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে এনেছেন বেদনা। সেই বেদনার ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে ক্ষোভ, উঠে এসেছে দ্রোহ, উঠে এসেছে ঘৃণার তীব্রতা।

ভোলায়া ভালায়া আর কথা দিয়া কতোদিন ঠাগাইবেন মানুষ

ভাবছেন অহনো তাদের অয় নাই হুঁশ।

গোছায়া গাছায়া লন বেশি দিন পাইবেন না সময়

আলামত দেখতাছি মানুষের অইবোই জয়।

কলিমুদ্দিনের পোলা চিডি দিয়া জানাইছে,ু’ভাই

আইতাছি টাউন দেখতে একসাথে আমরা সবাই,

নগরের ধাপ্‌পাবাজ মানুষেরে কইও রেডি অইতে

বেদম মাইরের মুখে কতোক্ষণ পারবো দাঁড়াইতে।’

টিকেট ঘরের ছাদে বিকালে দাঁড়ায়ে যখন যা খুশি যারা কন

কোনো দিন খোঁজ লইছেন গ্রামের লোকের সোজা মন

কী কী চায়, কতোখানি চায়

কয়দিন খায় আর কয়বেলা না খায়া কাটায়।

রাইত অইলে অমুক ভবনে বেশ আনাগোনা, খুব কানাকানি,

আমিও গ্রামের পোলা চুত্‌মারানি গাইল দিতে জানি।

(যার যেখানে জায়গা)

কবিতা রচনাকালের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ১৯৬৯-এ যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি ১৯৮০/১৯৮১ সালেও লিখেছেন প্রথম কাব্যগ্রন্থের কবিতা। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি লিখেছেন, এই লেখার ভেতর দিয়ে তাই উঠে এসেছে তার অভিজ্ঞতা। আগেই বলেছি যদিও, যে এই অভিজ্ঞতা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাই নয়, এর ভেতরে রয়েছে সেই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে সারাংশ গ্রহণের প্রক্রিয়া। দীর্ঘ কবিতা রচনাকালে হেলাল হাফিজ শুধু মাত্র ৫৮টিই কবিতা রচনা করেছেন, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। বরং তার শব্দ ব্যবহারের সচেতনতার প্রতি লক্ষ্য করে অনুমান করা যায়, তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রথম কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। প্রত্যেক কবিই চান তার সৃষ্টিকে ছাপিয়ে আরো আরো এগিয়ে যেতে। নিজের ভেতরে যে অতৃপ্তি কাজ করে তাই শিল্পীকে এগিয়ে নেয় নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে নতুনের দিকে। হেলাল হাফিজ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে শিল্প তৈরি করেছেন, তাকে ছাপিয়ে আরো নতুন কিছু তৈরিতে পরবর্তীতে আগ্রহী হননি, সে কি নিজেকে আর অতিক্রম করে না যাবার শংকা, নাকি অন্য কিছু, তার ব্যখ্যা স্বয়ং কবিই দিতে পারেন। হেলাল হাফিজ লিখেছেন খুবই কম, আরো লেখার সুযোগ তার রয়েছে, তবু দীর্ঘ ২৮ বছরেও (১৯৮৬-২০১৪) তিনি আর নতুনের দিকে ঝোঁকেননি। নিজেকে প্রকাশের জন্য নতুন করে আর শব্দের আশ্রয় নেননি।

আমি আর আহত হবো না,

কোনো কিছুতেই আমি শুধু আর আহত হবো না।

যে নদী জলের ভারে হারাতো প্লাবনে

এখন শ্রাবণে সেই জলের নদীর বুকে

জলাভাবে হাহাকার দেখে আমি আহত হবো না।

সবুজ সবুজ মাঠ চিরে চিরে

কৃষকের রাখালের পায়ে গড়া দু’পায়া পথের বুকে

আজ সেই সরল সুন্দর সব মানুষের চিতা দেখে

আহত হবো না, আর শুধু আহত হবো না।

বৃক্ষ হারালে তার সবুজ পিরান, মৃত্তিকার ফুরালে সুঘ্রাণ,

কষ্টের ইস্কুল হলে পুষ্পিত বাগান, আমি আহত হবো না।

পাখি যদি না দেয় উড়াল, না পোড়ে আগুন,

অদ্ভুত বন্ধ্যা হলে উবর্রা ফাগুন, আমি আহত হবো না।

মানুষ না বোঝে যদি আরেক মানুষ

আমি আহত হবো না, আহত হবো না।

কবিতার কসম খেলাম আমি শোধ নেবো সুদে ও আসলে,

এবার নিহত হবো

ওসবের কোনো কিছুতেই তবু শুধু আর আহত হবো না।

(কবিতার কসম খেলাম)

হেলাল হাফিজ প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর স্বেচ্ছাকৃত আড়াল তৈরি করেন, সেই আড়াল তিনি দীর্ঘ সময় ভাঙ্গেননি। ভাঙ্গতে দেননি। নিজেকে আড়ালে রাখলেও, তিনি তার কবিতাকে আড়ালে রাখতে পারেননি। মানুষ মানুষকে না বুঝলেও বুঝে নিয়েছে তার কবিতার আড়াল। ফলে সামান্য কয়েকটি কবিতায় তিনি শব্দের যে জাদু তৈরি করেছেন, ছন্দের যে মহনীয়তায় ধরে রেখেছেন পাঠককে, ভাব এবং ভাষার প্রকাশে পাঠককে নিজের সঙ্গে যে একা্ততার সেতুতে যুক্ত করছেন, তাই তাকে বাংলা কবিতার ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : উৎস থেকে উজানে

ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল একদিকে কবি ও অপরদিকে নাট্যকার। আট নয় বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে নাটক রচনার ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর জীবনকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে তিনি যে বৈচিত্র্যময় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সাহিত্য দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ভাববিলাসের উপাদান ছিল না কখনোই, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ-পরিবেশকে তুলে ধরা ও তার অসঙ্গতির প্রতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যক্তি জীবনেও দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সেইসঙ্গে সরলতা, উদারতা ও রসিকতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। বলাবাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনায় তাঁর এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই (১২৭০, ৪ শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ছিলেন। মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রারম্ভিক লেখাপড়া কৃষ্ণনগরেই অ্যাংলো ভার্ণাক্যুলার স্কুলে হয়। ১৮৭৮ সালে কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর বি.এ পড়বার জন্য তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। বি.এ পাশ করে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পড়বার জন্য তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে এম.এ পাশ করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি বিলাতে যান। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সেখানে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ করে F.R.A.S উপাধি পান এবং দেশে ফিরে আসেন। এই বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। কিছু সময় পর সেটেলমেন্ট অফিসারের পদ পান। ১৮৮৭ সালে সুরবালা দেবীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ হয়। ১৮৯৪ সালে তিনি আবকারী বিভাগের প্রথম ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মাত্র পঞ্চাশ বছর আয়ুষ্কালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ মেধাবী ও স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী উদাসীন প্রকৃতির অথচ সু-বক্তা ও সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্রেও ছিল তাঁর গভীর অভিনিবেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যেও তিনি সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এর ফলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বৃত্তি নিয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যাবার সুযোগ পান তিনি। এই সময় থেকে ‘নব্যভারত’, ‘আর্য্য-দর্শন’, ‘বান্ধব’ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর নানান প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাড়বার পর তিনি দুই মাস মধ্যপ্রদেশের র‍্যাভেলগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সময় কিছুকাল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তিনি দূরে ছিলেন ঠিকই তবে তাঁর কলম একেবারে থেমে থাকেনি। তিনি তাঁর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশে প্রবাসকালের নানান অভিজ্ঞতা ‘সেজদা’ জ্ঞানেন্দ্রলাল ও ‘রাঙ্গাদা’ হরেন্দ্রলালকে পত্রাকারে লিখে পাঠাতে থাকেন। এইসকল পত্রগুলির অধিকাংশই জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল দ্বারা প্রকাশিত ‘পতাকা’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ‘বিলাত-প্রবাসী’ নামে প্রকাশিত হত। বিদেশে থাকাকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্য, সঙ্গীত ও থিয়েটারের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ জন্মায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেক্সপীয়র প্রমুখের সাহিত্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। সেখানকার বিখ্যাত সব থিয়েটারে তিনি প্রায়ই যেতেন। এখানে থাকাকালীন তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ‘The Lyrics of Ind’ প্রকাশিত হয়।

কথায় আছে, “Poets are born, not made.” দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এমনই এক অসাধারণ কবিপ্রতিভা। মাত্র সাত/আট বছর বয়সে দাদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়কে তিনি একটি ভাবাত্মক সঙ্গীত রচনা করে তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন বলেও জানা যায় –

“গভীর নিশীথ কালে নিরজনে বসিয়া –

কে তোমার প্রতি নিশি রহ নভ শোভিয়া ?”

গানটি কোনও অংশেই একটি বালকের রচনা বলে মনে হয় না। যদিও এই সঙ্গীতানুরাগ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁর গৃহে বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদকদের বৈঠক হতে দেখেছেন। ছোটবেলায় গানের মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রতিভার প্রকাশ, আর এই গান জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা, প্রহসন ও নাটককে একটি সমন্বয়সূত্রে বেঁধে রেখেছিল তাঁর এই গীতিধর্মিতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্য সাধনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি যে সকল ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন তার জনপ্রিয়তার মূলে ছিল স্বদেশপ্রেমের এই সঙ্গীতগুলি। একটি সমসাময়িক যুগের পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন ঠিকই তবে তিনি যখন লেখেন -“বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ”, তখন তা কালের গণ্ডীকে পার করে হয়ে ওঠে চিরন্তন।

বিদেশে যাবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আর্যগাথা’ (প্রথম ভাগ-১৮৮২) নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন -“আর্যগাথা কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মনের সমুদ্ভূত ভাবরাজি ভাষার সংগ্রহ।” কবির ১২ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা গানগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত। কবি-জীবনের সূচনা পর্বের এই কাব্যে রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস দেখা যায়। গ্রন্থটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার বিভিন্ন সমালোচক মহলে ও সংবাদপত্রে নবীন কবি রূপে দ্বিজেন্দ্রলালকে অভিনন্দন জানানো হয়। ‘আর্যগাথা’ (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হবার পর ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি কাব্য ‘The Lyrics of Ind’ . কাব্যটি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত হলেও এই একটি মাত্র ইংরেজি কাব্য ছাড়া তিনি আর কোন ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় ‘আর্যগাথা’ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ। ‘আর্যগাথা’র প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান প্রায় দশ বছর। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। নব-পরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং কবির দাম্পত্য প্রেমের মধুরতম হৃদয়ানুভূতি এই কাব্যগ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশে থাকাকালীন যেমন বিভিন্ন থিয়েটারে যেতেন, বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পরও তিনি তেমনই কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে যেতেন অভিনয় দেখতে। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের অভিনয় একদিকে যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, অপরদিকে তার মধ্যেকার কুরুচি তিনি মেনে নিতে পারেননি। বাংলা মঞ্চের এই ত্রুটি দূর করবার উদ্দেশ্যেই তিনি ‘কল্কী- অবতার’ (১৮৯৫) নামক প্রহসন রচনা করেন। নাট্যকার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “বর্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেতফেরত এই পঞ্চসম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে।” প্রহসনটির সম্পূর্ণ নাম ‘সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার’। সমকালীন তথাকথিত আধুনিক কলকাতার চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন নাট্যকার এই প্রহসনের মাধ্যমে। ‘কল্কি-অবতার’-এর মাধ্যমে সমাজের যে ত্রুটির দিকটি তিনি তুলে ধরেছিলেন, সেই পরম্পরা তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে চলেছে আরও কিছু কাল। সেই সূত্র ধরেই তিনি লিখলেন ‘বিরহ’ (১৮৯৭) নামক প্রহসন। এক প্রৌঢ় ও তার তৃতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভ্রান্তিকে ঘিরে এক অদ্ভুত হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই প্রহসনে। এই সময়ে লেখা কাব্যের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত ‘আষাঢ়ে’ এই ধরণেরই এক কাহিনিকেন্দ্রিক হাস্যরসাত্মক কাব্য। ‘আষাঢ়ে’ কাব্যের ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন যে, এর কাব্য-কাহিনিগুলি সাধনা, সাহিত্য ও প্রদীপ পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছিল। সেই বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি একত্রিত করে ‘আষাঢ়ে’ নাম দিয়ে পুণরায় প্রকাশিত করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের মূল আকর্ষণ ‘হাসির গান’(১৯০০)। হাস্যরসের মাধ্যমে সমকালীন রক্ষণশীল সমাজকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন অভিনব ভঙ্গিতে। সেইসঙ্গে এর বিষয়বৈচিত্র্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বিবাহ বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে লেখা প্রহসন ‘ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার’ প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে। প্রহসনটির প্রারম্ভেই দ্বিজেন্দ্রলাল উল্লেখ করেছেন, “প্রহসনখানিকে উদ্দেশ্যহীন বিবেচনা করাই শ্রেয়ঃ”। প্রহসনে একই পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ করবার জন্য পিতা ও পুত্রে আগ্রহ এবং পিতামহ ও পৌত্রের একই পাত্রিতে আসক্তি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। তৎকালীন সামাজে প্রচলিত বিবাহ প্রথার এক হাস্যকর ছবি তুলে ধরেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে। এরপর প্রকাশিত ‘প্রায়শ্চিত্ত’(১৯০২) প্রহসনে ইংরেজি শিক্ষিতএবং ‘বিলাত ফেরতা’ সমাজকে কটাক্ষ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। প্রহসনটি তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। একই সময়ে প্রকাশিত ‘মন্দ্র’ (১৯০২) একটি ব্যঙ্গকবিতার সংকলন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত রচনাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কাব্য ও গান, প্রহসন এবং নাটক। প্রারম্ভিক জীবনে কাব্য ও প্রহসন রচনার প্রতি তাঁর যে ঝোঁক ছিল তা পরবর্তীকালে অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। সেই সময় নাটক রচনার প্রতি তাঁর অধিকতর আগ্রহ দেখা যায়। সমাজের উপর যে আক্রমণাত্মক মনোভাব তাঁর প্রথম যুগের প্রহসনে দেখা যায়, তা নাটক রচনার যুগে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তবে সমাজ-সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র লক্ষণীয়। যদিও তাঁর নাটক রচনার প্রারম্ভ কাব্য ও প্রহসন রচনার যুগ থেকেই।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বপ্রথম নাটক ‘পাষাণী’। নাট্যকার স্বয়ং একে ‘গীতি-নাটিকা’ বলেছেন। এটি অমিত্র পয়ার ছন্দে লেখা একটি তত্ত্বমূলক ও গীতিবহুল নাটক। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পাশাপাশি তিনি নাট্যকারও - এই দুই সত্তার মিলিত প্রকাশ তাঁর নাট্যকাব্যগুলিতে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে ‘পাষাণী’ নাটকের কাহিনি নেওয়া হলেও এর নাট্য-পরিকল্পনাতে দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। রাজর্ষি জনকের কথামত বিশ্বামিত্র ঋষি গৌতমকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর আশ্রমে আসেন। গৌতমের স্ত্রী অহল্যা পঞ্চদশ বর্ষিয়া পরমা সুন্দরী যুবতী। ঐহিক ভোগ-বাসনায় তাঁর চরম আসক্তি। অথচ বৃদ্ধ ঋষি গৌতম এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। বিশ্বামিত্র ঋষি গৌতম ও অহল্যাকে পরীক্ষা করবার জন্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবার পরিকল্পনা করলেন। সেই অনুযায়ী তিনি তপস্যার নাম করে গৌতমকে অহল্যার থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইলেন। গৌতমও বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করলেন। তার রূপ-যৌবনের প্রতি গৌতমের এই অবহেলা অহল্যার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। এমন সময় অহল্যার রূপের কথা শুনে ইন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। অহল্যাও ইন্দ্রকে দেখামাত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং উভয়ের মিলন হল। একসময় গৌতমের আশ্রমে ফিরে আসার সংবাদ এল। ইন্দ্র অহল্যাকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল অহল্যার পুত্র শতানন্দ। প্রচণ্ড ক্রোধে ইন্দ্র অহল্যার সামনেই শতানন্দের কণ্ঠরোধ করে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে অহল্যাকে নিয়ে কৈলাস পর্বতের এক নির্জন শিখরে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা দু’জন কিছুকাল বাস করবার পর ক্রমে অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের আসক্তি মিটে গেল। তিনি অহল্যাকে ত্যাগ করে ফিরে গেলেন স্বর্গরাজ্যে। শুরু হল অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত। তিনি ফিরে এলেন গৌতমের শূন্য আশ্রমে। একদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ গৌতমের আশ্রমে এলেন। অহল্যার দুঃখ দেখে শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে গৌতমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার উপদেশ দিলেন। জনকের রাজসভায় অহল্যা গৌতমের কাছে তাঁর সমস্ত পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। গৌতম তাকে ক্ষমা করে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন। বিশ্বামিত্র গৌতমের মাহাত্ম্য দেখে মুগ্ধ হলেন। অহল্যা-গৌতমের মূল কাহিনির সঙ্গে ‘পাষাণী’ নাটকে চিরঞ্জীব-মাধূরীর একটি উপকাহিনিও রয়েছে। মহর্ষি গৌতমের সংস্পর্শে এসে দস্যু চিরঞ্জীবের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। দস্যুবৃত্তি ছেড়ে সে গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। অপরদিকে মিথিলার শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনা মাধূরী ঋষি গৌতমকে প্রলুব্ধ করতে গিয়ে বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। সে ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোযোগ দিল। তারপর ঋষি গৌতম চিরঞ্জীব-মাধূরীর বিবাহ দিলেন। সমাজ-সচেতন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে মূল রামায়ণ-কথার সামান্য পরিবর্তন করে তাতে অনেকখানি আধুনিকতা নিয়ে এসেছেন।

পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রচনার অন্যতম উপাদান ছিল। সমকালের প্রেক্ষিতে দ্বিজেন্দ্রলালকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রারম্ভিক যুগে টডের ‘অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান’ (প্রথম খণ্ড–১৮২৯, দ্বিতীয় খণ্ড–১৮৩২) গ্রন্থ এবং মধ্যযুগের মোগল–রাজপুত ইতিহাস ছিল নাট্যকারের প্রধান উপজীব্য। টডের গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি চারখানি নাটক রচনা করেন-‘তারাবাঈ’, ‘প্রতাপসিংহ’, ‘দুর্গাদাস’ ও ‘মেবার পতন’।

রাজস্থানের কাহিনি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম নাটক ‘তারাবাঈ’(১৯০৩)। গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত এই নাটকের পদ্যাংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। মেবারের বৃদ্ধ রাণা রায়মলের তিন পুত্র – সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল। পিতার মৃত্যুর পর এদের মধ্যে কে রাণা হবে এই নিয়ে সঙ্গ ও পৃথ্বী রাণার সম্মুখেই বিবাদে শুরু করলেন। ক্রোধে রাণা পৃথ্বী এবং সঙ্গকে রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ পুত্র জয়মলকে ভবিষ্যতের রাণা বলে ঘোষণা করলেন। মনের দুঃখে সঙ্গ নিরুদ্দেশ হলেন। অপরদিকে রাণা রায়মলের ভাই সূর্য্যমল মেবারের সিংহাসন অধিকার করবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পৃথ্বী তাকে পরাজিত করেন এবং তোড়ার রাজকন্যা তারাবাঈকে বিবাহ করেন। তোড়ার অধিপতি তাঁর সমগ্র রাজ্য পৃথ্বীকে দান করবার সংকল্প নেন। কিন্তু রায়মলের জামাতা প্রভুরাও মেবারের সিংহাসন লাভ করতে ইচ্ছুক। তিনি পৃথ্বীকে তার এই উদ্দেশ্য সাধনে সবথেকে বড় বাধা বিবেচনা করে পৃথ্বীর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁর হত্যা করেন। পতির মৃত্যুশোকে তারাবাঈ নিজেও আত্মঘাতিনী হন।পৃথ্বী ও তারাবাঈয়ের জীবনের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা পড়ে। নাটকের প্রধান চরিত্র পৃথ্বী। নাটকটির নাম ‘তারাবাঈ’ হলেও নাম-চরিত্র এখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি।

পরবর্তী নাটক ‘প্রতাপসিংহ’(১৯০৫)-এর আখ্যানভাগও টড্‌-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া। নাটকটির কাহিনি ঐতিহাসিক হলেও তাতে দেশাত্মবধের প্রবণতা অধিকতর পরিস্ফুটিত। মেবার রাজপুতানা মুঘল সম্রাট আকবরের অধিকারে। মেবারের রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপসিংহ সপরিবারে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি রাজপুত সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করতে চান। সম্রাট আকবর প্রতাপসিংহকে পরাজিত করবার জন্য তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করলেন। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহ বিশাল মোগল সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে প্রতাপসিংহ অসীম বীরত্বের পরিচয় দিলেও অবশেষে তিনি পরাজিত হনেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। শেষপর্যন্ত প্রতাপসিংহ মেবারের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করতে পারলেও রাজধানী চিতোর জয় করতে পারলেন না। এই একই গ্রন্থ থেকে উপকরণ নিয়ে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি নাটক ‘দুর্গাদাস’। নাটকের উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছেন – “যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চির আরাধ্য পিতৃদেব কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম”। ঔরঙ্গজীবের চক্রান্তে যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। মোঘল সম্রাট যশোবন্তের বিধবা পত্নী মহামায়া ও শিশুপুত্র অজিতসিংহকে বন্দী করতে চাইলেন। কিন্তু মাড়বার সেনাপতি দুর্গাদাস তাঁদের ঔরঙ্গজীবের কবল থেকে মুক্ত করেন। মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করলে দুর্গাদাস পরিচালিত রাজপুত সৈন্যের সম্মুখে তারা পরাজিত হয় এবং ঔরঙ্গজীবের পুত্র আকবর সপরিবারে বন্দী হন। অগত্যা ঔরঙ্গজীব রাজপুতদের সঙ্গে সন্ধী স্থাপন করেন। যশোবন্তের বিধবা স্ত্রী পুত্র অজিতসিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে পতির উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করেন। ঘটনাক্রমে দুর্গাদাস ঔরঙ্গজীবের হাতে বন্দী হন।সম্রাজ্ঞী গুল্‌নেয়ার বন্দী দুর্গাদাসের কাছে প্রণয় নিবেদন করেন। কিন্তু দুর্গাদাস তা প্রত্যাখ্যান করেন। দুর্গাদাসের চরিত্রবলে মুগ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজীবের সেনাপতি দিলির খাঁ তাঁকে মুক্ত করে দেন। দুর্গাদাস রাজপুতানায় ফিরে আসেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকা পড়ে। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় দুর্গাদাস চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের ভাবরূপকে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। সেইসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপন করবার প্রয়াসও দেখা যায় এখানে।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক ‘নুরজাহান’। সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা এই নাটকটিতে নুরজাহানের প্রারম্ভিক জীবন থেকে আরম্ভ করে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নুরজাহানের জীবন দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমত, তিনি শের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসা। দ্বিতীয়ত, তিনি ভারত-সম্রাজ্ঞী নুরজাহান। ইতিহাসে জানা যায়, মেহেরউন্নিসা তাঁর স্বামী শের আফগানকে যথার্থই ভালবাসতেন। কিন্তু নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নুরজাহান চরিত্রে সামান্য পরিবর্তন করেছেন। মেহেরউন্নিসা এখানে শের আফগানের প্রতি প্রেমাসক্ত নয়। জাহাঙ্গীরকেও তিনি ভালবাসেন না। তিনি কেবলমাত্র ভারত-সম্রাজ্ঞী হওয়ার মোহে জাহাঙ্গীরের পত্নীত্ব স্বীকার করেছিলেন। নুরজাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁর জীবনে ট্র্যজিডি নিয়ে এসেছে – একথা নাটকের শেষে নুরজাহান নিজেও স্বীকার করেছেন।

‘তারাবাঈ’ রচনার পর দ্বিজেন্দ্রলালের আর একখানি কাব্যধর্মী নাটক ‘সোরাব রুস্তম’(১৯০৮)। অমিত্রাক্ষর ও গদ্য উভয়েই লিখিত তিন অঙ্কের এই নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষুদ্রতম নাট্যকাব্য। নাটকে গুস্তাহামের কন্যা আফ্রিদ সোরাবকে ভালোবাসে। কিন্তু সোরাব তার পিতৃহন্তা। তাই সে প্রতিশোধ নিতে চায়। শেষে রুস্তম তার পুত্র সোরাবকে হত্যা করে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে। নাটকটি বীর রসাত্মক অথচ বিষাদান্তক। পারসী কবি ফেরদৌসীর কাব্য ‘শাহ্‌নামা’র অন্তর্গত ‘সোরাব রুস্তম-এর কাহিনি অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকটি রচনা করেন। নাটকটিকে দ্বিজেন্দ্রলাল ‘অপেরা’ রূপে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। তাই নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন –“আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে, সুরুচি-সঙ্গত অপেরা এখন চলে কি না”। তবে “ইহা দস্তুরমত অপেরা নয়” আবার “ইহা নাটকও নহে” – একথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। আফ্রিদের পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টার মধ্যে সমসাময়িক দেশাত্মবোধের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজপুত জীবন নিয়ে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ নাটক ‘মেবার পতন’(১৯০৮)।মেবারের রাণা অমরসিংহ। সৈন্য অধিনায়ক হেদায়েৎ আলি খাঁ এর পরিচালনায় মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করে। কিন্তু রাজপুতদের পরাক্রমে মোগল পরাজিত হয়। পরপর দু’বার মোগল সৈন্য পরাজিত হবার পর তৃতীয়বার মহাবৎ খাঁ-এর নেতৃত্বে মোগলবাহিনী মেবার আক্রমণ করে। কিন্তু দুই যুদ্ধে মেবারের বহু সৈন্য ক্ষয় হওয়ায় রাজপুতদের কাছে মোগল সৈন্যকে বাধা দেওয়ার মত শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। মেবারের পতন হয় এবং উদয়পুরের দুর্গ মোগল সৈন্য অধিকার করে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন –“এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী”। সমসাময়িক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের অভিব্যক্তি নাটকে অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস করেছেন নাট্যকার।

একই সময়ে মিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক সীতা (১৯০৮)। নাটকটি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত রাম দ্বারা সীতা নির্বাসনের কাহিনি অবলম্বনে লেখা। তবে এক্ষেত্রে নাট্যকার ভবভূতির ‘উত্তর রামচরিত’ বা বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যায়িকার অন্ধ অনুকরণ করেননি। কাহিনি পরিকল্পনা, চরিত্র চিত্রণ, সমাজ-পরিবেশ – সর্বত্রই নাট্যকার তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন।

মোগল সম্রাট সাজাহানের শেষ জীবনের ঘটনাকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন ‘সাজাহান’(১৯০৯) নাটক। এটিকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলা হয়ে থাকে। পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব নাটকের মূল বিষয়বস্তু। অসুস্থ বৃদ্ধ সাজাহান মৃত – এই জনরব শোনামাত্র তাঁর চার পুত্রের মধ্যে বাংলার সুবাদার শাহ্‌জাদা সুজা, গুজরাটের সুবাদার শাহ্‌জাদা মোরাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরঙ্গজেব সসৈন্য দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করবার জন্য এগিয়ে আসেন। শাহ্‌জাদা দারা পিতার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহী ভ্রাতাদের দমন করবার জন্য অগ্রসর হলেন। অপরদিকে ঔরঙ্গজেবের কৌশলে দারা ও মোরাদ বন্দী হলেন এবং সুজা সপরিবারে আরাকানে বিতাড়িত হলেন। ঔরঙ্গজেব দারা ও মোরাদকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। পিতা সাজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। কন্যা জাহানারা বন্দী পিতার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করলেন। অবশেষে অনুতপ্ত ঔরঙ্গজেব পিতার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মাতৃহারা পুত্রদের যে স্নেহ দিয়ে সাজাহান বড় করেছিলেন, সেই স্নেহই বড় হয়ে উঠেছে নাটকে। অনুতপ্ত ঔরঙ্গজেবকে তিনি ক্ষমা করেছেন। নাটকের শেষে প্রতিনায়ক ঔরঙ্গজেবের জয় হলেও সাজাহানের পিতৃস্নেহই বড় হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অতি জনপ্রিয় নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’(১৯১১)। মগধরাজের শূদ্রাণী-গর্ভজাত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত। তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়ে তিনি সিন্ধুনদের তীরে আসেন গ্রীক যুদ্ধ কৌশল শেখবার জন্য। সেখানে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেইসঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করেন। চাণক্যকে মগধরাজ নন্দ অপমানিত করেছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্তকে অস্ত্ররূপে কাজে লাগাতে চান। মলয়রাজ চন্দ্রকেতু ও নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়ন চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এঁদের সৈন্য-সহায়তা ও চাণক্যের নির্দেশে চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ্য আক্রমণ করেন। নন্দ পরাজিত ও বন্দী হন। চাণক্যের নির্দেশে কাত্যায়ন নন্দকে বধ করেন। চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসলেন। চাণক্য হলেন তাঁর মন্ত্রী। চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন। এদিকে সেকেন্দার শাহ–এর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলুকস সমগ্র এশিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি ভারতবর্ষে গ্রীক প্রাধান্য কমে আসছে দেখে ভারতে আক্রমণ করলেন। কিন্তু চাণক্যের কৌশলে সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে সন্ধী হল। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকসের বিদুষী কন্যা হেলেনের বিবাহ হল।

ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলির মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনকে দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থক ভাবে রূপায়িত করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমকালে যে জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সেই বিপ্লবকে মূর্ত করে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার শেষযুগে দ্বিজেন্দ্রলাল আবার ফিরে আসেন প্রহসন রচনায়। এই সময়ে তিনি লেখেন ‘পুনর্জ্জন্ম’(১৯১১) নামক প্রহসন। এটি একটি ঘটনাবহুল অথচ ক্ষুদ্র প্রহসন। যাদব চক্রবর্তী নামে এক কৃপণ ও অত্যাচারী মহাজনকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তার আত্মীয় বন্ধু এমনকি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এতে যাদব চক্রবর্তীর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়।দ্বিজেন্দ্রলাল কাহিনির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রহসনের ভূমিকায় বলেছেন, “ডীন সুইফট্‌ সত্য সত্যই একজন জীবিত জ্যোতিষী পঞ্জিকাকারকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া পঞ্জিকাকার শেষে আপনাকে জীবিত প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীল নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে তথাপি পঞ্জিকাকার স্বীয় অস্তিত্ব সন্তোষকর রূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সেই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে।” প্রহসনটির কাহিনি বিদেশের হলেও নাট্যকার এতে বাঙালী পরিবেশ পরিস্থিতিকে এমন ভাবে স্থাপন করেছেন যে তার মূল বিদেশি কাহিনি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের প্রধান আকর্ষণ তার হাসির গান। সর্বসাধারণের মধ্যে তিনি ‘হাসির কবি’ বলেই বেশি পরিচিত। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের অনেকখানি অভাব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ও গানগুলি তাঁর স্বতন্ত্র রচনাশৈলী দ্বারা পরিপুষ্ট। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতীত্ব করেননি। সমাজের যেখানেই তিনি অসঙ্গতি দেখেছেন সেখানেই তাঁর ব্যঙ্গের কশাঘাত পড়েছে। সর্বত্র তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তৎকালীন বাংলার সমাজ-মানসিকতা এর মূল ভিত্তি। এ-প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তিনি ‘একঘরে’ নামক একটি নক্‌সা জাতীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রহসনেএকদিকে তিনি যেমন সামাজিক গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার ওপর তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন, অপরদিকে তেমনই তিনি বিলাত ফেরত সমাজের অতিরিক্ত সাহেবিয়ানাকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। তাঁর প্রহসনগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ-ইতিহাসের সুস্পষ্ট চিত্রণ লক্ষণীয়। সেদিক থেকেও এই প্রহসনগুলি বিশেষ মূল্যবান।

‘আলেখ্য’(১৯০৭) ও ‘ত্রিবেণী’ (১৯১২) নামক দ্বিজেন্দ্রলালের দুখানি কাব্যগ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবিকে যে বিষাদময়তা ঘিরে রেখেছিল, সেই অনুভূতি উঠে এসেছে এই কাব্য দুটিতে। এই সময়ে তিনি পরপারে (১৯১২) নামক একটি সামাজিক নাটক রচনা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-জীবনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তারপর তাঁদের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বন্ধুত্ব স্থায়ী হতে পারেনি। একসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মতবিরোধ চরম সীমায় পৌঁছে যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করে ‘আনন্দ বিদায়’(১৯১২) নামক প্যারডি লেখেন। যদিও ‘আনন্দবিদায়’-এর ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন –“একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় ও অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না”। কিন্তু তাঁর এই যুক্তি সাহিত্যিক-মহলে স্বীকৃতি পায়নি। ‘আনন্দ বিদায়’ প্রকাশের ছ’মাস পর দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘ভীষ্ম’ নামক পৌরাণিক নাটক। নাটকটির ভাষা গদ্যপদ্য মিশ্রিত। পদ্যাংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্র অবলম্বনে লেখা নাটকটিতে নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনার অধিকতর স্থান পেয়েছে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার নিজেও সে-কথা স্বীকার করেছেন –“কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি।” বস্তুত, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাণকে শুধুমাত্র ভক্তি দিয়ে নয়, যুক্তি ও মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন। তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর চরিত্রগুলি পুরাণের যুগকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে আধুনিক ভাবাপন্ন।

বিজয়সিংহের সিংহল জয়ের কাহিনিকে অবলম্বনে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সিংহল বিজয়’ নাটক। পণপ্রথা এবং বাল্যবিবাহের বিরধিতা করে তিনি ‘বঙ্গনারী’ (১৯১৫) নামক সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। এটি লেখা হয়েছিল ‘পরপারে’ নাটকের সমকালে। ‘পরপারে’ নাট্যকারের জীবীতকালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ‘বঙ্গনারী’ প্রকাশ পায় নাট্যকারের মৃত্যুর প্রায় দু’বছর পর।

বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল বিভিন্ন সভা-সম্মেলনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগরে স্কুলে পড়াকালীন তিনি তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও বন্ধুদের নিয়ে ‘চাদর-নিবারিণী সভা’ স্থাপন করেন। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, অনাবশ্যক চাদর ব্যবহার করে অর্থব্যয় না করা। যদিও পরবর্তীকালে বাল্যকালের এই উৎসাহকে তিনি হাসির গানের মাধ্যমে নিজেই ব্যঙ্গ করে বলেছেন –

“ডাল-ভাতের দফা কর সবাই রফা ,

কর শীগ্‌গীর ধুতি- চাদর- নিবারিণী সভা”-

১৯০০ সালে মেট্রোপলিটন কলেজের কিছু ছাত্র মিলে ‘ফ্রেন্ডস্‌ ড্রামাটিক ক্লাব’ গঠন করেন। কিন্তু সভ্যদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় কিছু সদস্য মিলে ‘কলকাতা ইভিনিং ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের সভাপতিত্বের দায়িত্ব নেন দ্বিজেন্দ্রলাল। নিয়মিত নাটক অভিনয়, খেলাধুলা, সাহিত্যিক বিচার-আলচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোই ছিল এই ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য।

১৯০৫ সালে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের ৫ নং সুকীয়া স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি ‘পূর্ণিমা-মিলন’ নামক একটি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সহ কলকাতার নামকরা বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশন প্রায় দু’বছর ধরে নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দ্বিজেন্দ্রলালের খুলনায় বদলি হয়ে যাওয়ায় এই অনুষ্ঠান অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘকাল পর জীবনের অপরাহ্নে তাঁর উৎসাহে তাঁর কলকাতার বাসভবন ‘সুরধাম’-এ আবার ‘পূর্ণিমা-মিলন’ অনুষ্ঠিত হয়। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই অধিবেশনে। স্বল্পায়ু হলেও সে-যুগের বিদগ্ধ বাঙালিদের এই অধিবেশন আকর্ষিত করেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, সারদাচরণ মিত্র,গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, দামদর মুখোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শেষজীবনে‘ভারতবর্ষ’ নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২০) জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল ‘সূচনা’ অংশও লিখেছিলেন এবং ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবীতকালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় বত্রিশ বছর বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যোগদান করেন। বিদেশে থাকাকালীন ইংরেজি নাটকের টেকনিককে তিনি সুন্দর ভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। তারই সার্থক প্রয়োগ করেছেন তিনি বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্যের মধ্যে যেমন রোমান্টিকতার স্পর্শ রয়েছে তেমনি তাঁর প্রহসনে রয়েছে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ স্বর। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে যেমন উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিল, তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি তেমনি প্রাচীনের মধ্যে সন্ধান করেছিল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিচিত্রমুখী সম্প্রসারণ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভারই পরিচায়ক।

লোকসংস্কৃতি ও বৌদ্ধ জাতক

মৌসুমী চক্রবর্তী

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

রাণী ধন্যাকুমারী কলেজ

মানুষের ইতিহাস যত প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ইতিহাসও তার থেকে খুব কম প্রাচীন নয়। কারণ লোকসংস্কৃতি মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রান্তের আদিম মানুষের মুখে যখন ভাষা ফোটেনি, যখন জঙ্গলের প্রাণীদের মতোই তারাও বনে জঙ্গলেই বসনাস করত, সেই সময়ও মানুষের ভিতরে যে আত্মপ্রকাশের একটা প্রেরণা কাজ করত তার কিছু কিছু নিদর্শন আজও পাহাড়ের গুহায় বা প্রত্নতাত্মিক আবিষ্কারে দেখতে পাওয়া যায়। এই আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই ক্রমে ক্রমে মানুষ মানুষ জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে পৃথক করে নিতে পেরেছে। বিভিন্ন প্রান্তের সেই সব লোকেদের নিজস্ব জীবন যাত্রা, নিজস্ব সভ্যতা গড়ে উঠতে সময় লেগেছে অনেক কিন্তু প্রতিটি প্রান্তের সাধারণ লোকদের যে বিশ্বাস, বেঁচে থাকার যে রীতি নীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যা কিছু উপকরণ, তার আত্ম প্রকাশের যতরকম মাধ্যম- এই সব কিছু দিয়েই ক্রমে ক্রমে বিশেষ বিশেষ প্রান্তের সাধারণ লোকেদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই লোক এবং এই লোকসংস্কৃতির উৎস বহু প্রাচীন কিন্তু এ সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা এবং ইচ্ছা বা অভিলাষ গড়ে উঠেছে আধুনিক যুগে। লোকসংস্কৃতিবিদ পণ্ডিতরা এদেশে ও বিদেশে এ সম্পর্কে বহু আলোচনা ও অনুসন্ধান করেছেন এবং ক্রমেই তাঁরা উৎসের দিকে এগোতে চেয়েছেন। লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমির উপর ক্রমেই নাগরিক সুসভ্য মানুষের অভিজাত সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন তারা। আধুনিক যুগের বঙ্গভাষী গবেষক, সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখেরা এ বিষয়ে সংগ্রাহকের এবং সমালোচকের কাজও করেছেন। এঁদের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু অধ্যাপকেরাও রীতিমতো লোকসংস্কৃতির গবেষণা করে আসছেন। অধ্যাপক পল্লব সেনগুত, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, শীলা বসাক, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অবদান এ বিষয়ে স্মরণ করতে হবে। এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরেও অন্যান্য বিষয়ের মতো লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যায়নের বিষয় রূপে প্রচলিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির উৎস কত প্রাচীন এবং লোক জীবনের এর প্রভাব কত ব্যাপক সে বিষয়ে সভাবতই অনুসন্ধিৎসা জাগে। আধুনিককালের বহু বিখ্যাত লেখকদের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান যেমন আছে তেমনই প্রাচীনকালের ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যেই লোকসংস্কৃতির উপাদান দুর্লক্ষ্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের পরে পালি ভাষা সাহিত্যের এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় জাতক কাহিনিগুলিতে।

জাতকগুলি গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুররূপে কোটিকল্পকাল জন্ম জন্মান্তর গ্রহণপূর্বক দান-শীলাদি দশ পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে অভিসম্বুবুদ্ধ অবস্থায় তাঁর স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্ম-বৃত্তান্তের জ্ঞান জন্মায়। শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার সময় গল্পচ্ছলে এই সকল অতীত কাহিনির উল্লেখ করে বুদ্ধ তাঁদের নির্বাণ অভিমুখে নিয়ে যেতেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ এবং সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক মিকায়ের একটি শাখা।

প্রত্যেক জাতকের পাঁচটি অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্তমান কাহিনি। এই অংশে বুদ্ধ কোথায় কোন প্রসঙ্গে কাহিনীটি বর্ণনা করেছিলেন তার বিবরণী পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অংশের নাম অতীতবস্তু; এই অংশে বুদ্ধের অতীত জন্ম-কাহিনি বিবৃত হয়েছে। অতীতবস্তুর মধ্যে যে পদ্যাংশ তা গাথা নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে গাথা পরিলক্ষিত হয়। গাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টীকা বা ব্যাখ্যাকে বলে ব্যায়াকরণ। পরিশেষে সমোধান বা সমবধান; এখানে অতীতবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদ প্রদর্শন করা হয়েছে।

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। সম্ভবত ৫৫০ টিরও বেশী এ জাতীয় কাহিনি প্রচলনে ছিল। কিন্তু ফৌসবোল-সম্পদিত ‘জাতকার্থবর্ণনা’ নামক পালি গ্রন্থে ৫৪৭ টি কাহিনি স্থান পেয়েছে।

খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে মৌর্যসম্রাট ধর্মাশোকের পুত্র মহেন্দ্র পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্মশাস্ত্র ও তাদের অর্থকথা নিয়ে ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে যান। সেখানে সিংহলী ভাষায় অর্থকথাগুলির অনুবাদ করা হয়। পালি ভাষায় রচিত মূল অর্থকথা বিনষ্ট হয়ে যায়। এর অনেক পরে সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলী থেকে পালি ভাষায় জাতক কাহিনিগুলির পুনরনুবাদ করেন। সেই রচনাই প্রামাণিক জাতক কাহিনিরূপে প্রচারিত হয়ে আসছে। সেই মূল পালি গ্রন্থ থেকে বাংলায় ৬ খন্ডে জাতকের অনুবাদ করেন শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বাংলায় বেশ কিছু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে জাতক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে সুকোমল চৌধুরী ‘মহামানব গোতম বুদ্ধ’, ‘গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন’, সাধনচন্দ্র সরকারের ‘জাতক ও অবদান সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন’, ‘বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য’ প্রভৃতি গ্রন্থে।

জাতক কাহিনিগুলির মধ্যে বুদ্ধের উপদেশ বা শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্যের উপাদান আছে সেগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সঙ্গে সেই যুগের লোকসংস্কৃতির উপাদানও এই বৌদ্ধ জাতক কাহিনিগুলিতা ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে। সংহত সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত যা কিছু; অর্থাৎ সঙ্গীত, সাহিত্য, ক্রীড়া, ঔষধ, যানবাহন, যন্ত্রাদি, বিশ্বাস, সংস্কার, শিল্পকলা, খাদ্য-এ সবই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। জাতকের কাহিনিতে লোকসংস্কৃতির এমন অসংখ্য উপাদান রয়েছে। সাধারণ লোকেদের জীবনধারণ পদ্ধতি, তাদের উৎসব, তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা জাতকে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের অবলম্বিত বহু পেশার বিবরণ রয়েছে ভীমসেন জাতক, গুণ জাতক, মদীয়ক জাতকে (তন্তুবায়); সূচী জাতক, কুশ জাতকে (কর্ম্মকার); মহা উন্মার্গ জাতক, সুধাভোজন জাতক (চিত্রশিল্পী) আরও অন্যান্য জাতকে। উন্মাদয়ন্তী জাতক, বর্ত্তক জাতক প্রভৃতিতে সাধারণ লোকেদের সমবেত আনন্দোৎসবের বর্ণনা আছে। নানারকম লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা রয়েছে বিষবান্ত জাতক, কামনীত জাতক প্রভৃতিতে; আজকের লোকসমাজেও যার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

জাতক কাহিনির মধ্যে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত এইসব লোকসংস্কৃতির উপাদান অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। জাতক কাহিনিগুলির মধ্যে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগের লৌকিক উপাদানও অবশ্যই আছে। সুতরাং এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

**পিতৃতন্ত্র ও বাম-রাজনীতি : মণিকুন্তলা সেনের আত্মকথার একটি নারীবাদী পাঠ**

**উষসী চক্রবর্তী**

**অধ্যাপিকা, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ**

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে গবেষক**

ভূমিকা: আমার এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য, নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে প্রথম প্রজন্মের কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতিচারণ ‘সেদিনের কথা’ নিয়ে আলোচনা করা এবং সেই সঙ্গে বাম্পন্থী পার্টির ভিতরের পিতৃতান্ত্রিক ঝোঁক নিয়ে এই নেত্রীর অভিজ্ঞতাকে পাঠ করা। তবে, এই গবেষণাপত্রের সীমাবদ্ধ পরিসরে সেই আলোচনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই এই গবেষণাপত্রকে কমিউনিস্ট মহিলাদের আত্মকথা বিষয়ে একটি প্রারম্ভিক আলোচনা বলা যেতে পারে।

**সেদিনের কথাঃ জড়ায়ে আছে বাধা , ছাড়ায়ে যেতে চাই**

১৯৪১ সাল থেকে ১৯৬০ এর দশক অবধি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন। পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিখণ্ডিত পার্টির সঙ্গে আর জুড়ে থাকতে চাননি। নিভৃতে সরে গিয়েছেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে। তবুও পার্টি ছেড়ে দেওয়ার দুই দশক পরে, স্মৃতিকথা প্রকাশের সময়ও, পার্টির আদর্শের প্রতি অনাস্থা দেখাননি মণিকুন্তলা। **সেদিনের কথা**-র শেষ পরিচ্ছেদে লিখেছেন,

...আমার কৈশোর-যৌবনের স্বপ্ন ও সংগ্রাম একদিন না একদিন সফল হবেই, এই অটল বিশ্বাস নিয়ে জীবনসায়াহ্নে বুকের আগুন বুকে চেপেই আমি কাল কাটাচ্ছি।1

এই স্বপ্ন ও ফেলে আসা পার্টির প্রতি মমত্ববোধ থেকেই হয়তো পার্টির ভিতরের লিঙ্গবৈষম্য, পার্টির ভিতরের পিতৃতন্ত্র নিয়ে সবসময় সরাসরি আক্রমণে জাননি মণিকুন্তলা। নিজেকে ‘নারীবাদী’ বলে দাবিও করেননি। ধ্রুপদী কমিউনিস্ট পার্টিতে ‘নারীবাদ’ শব্দটি খুব একটা গ্রহণযোগ্যও ছিল না। নিজেকে ‘নারীবাদী’ হিসাবে দাবি করলে ‘কমিউনিস্ট’ হিসাবে পার্টির কাছে উনি গ্রহণযোগ্য থাকবেন না এই সংশয়ও বোধ করি ওঁর মধ্যে ছিল। এ ছাড়া আরও একটি সংশয়, আরও একটি দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। পার্টির মধ্যেকার পিতৃতন্ত্রকে সরাসরি আক্রমণ করতে হলে এমন কিছু ব্যক্তির কথা বলতে হবে যাঁরা বেঁচে নেই। তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের সমালোচনা করা উচিত হবে কি না এ নিয়েও ওঁর মনে দ্বন্দ্ব ছিল। নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলনে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীর2 একটি মন্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে (এই নিয়ে পরে এই অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা আছে) এই দ্বিধার কথা লেখেনও তিনি,

শুধু একটাই আমার দ্বিধা। পি সি যোশী আজ জীবিত নেই। সেই অবস্থায় এ-প্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয় জেনেও তুলতে হচ্ছে।3

এত দ্বিধা, সংশয় থাকার কারণেই হয়তো পার্টির পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি তিক্ত আক্রমণে জাননি মণিকুন্তলা। অনুসরণ করেননি তাঁর ‘স্বপ্নের দেশ’ সোভিয়েতে তাঁরই এক পূর্বসূরির পদাঙ্ক। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী আলেকজান্দ্রা কোলনতাই ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *The Autobiography of a Sexually Emancipated Communist Woman*4 *নামে* আত্মজীবনীতে পার্টির ভিতরে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি কামান দেগেছিলেন। লিখেছিলেন,

…I realized for the first time how little our Party concerned itself with the fate of the women of the working class and how meagre was its interest in women’s liberation.5

এইখানেই থেমে থাকেননি কোলনতাই। পার্টির ভিতরে মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে উনি কতটা অসুবিধায় পড়েছিলেন লিখেছেন তাও:

…I threw myself into the struggle between the Russian suffragettes and strove with all my might to induce the working class movement to include the women question as one of the aims of its struggle in its program. It was very difficult to win my fellow members over to this idea. I was completely isolated with my ideas and demands. 6

কোলনতাইয়ের মতো এরকম সরাসরি আক্রমণের পথে জাননি মণিকুন্তলা। কিন্ত পার্টির ভিতরের পিতৃতন্ত্রের উপস্থিতি ও পার্টির কিছু নেতাদের মধ্যে এই মানসিকতা সম্পর্কে উনি যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং এ নিয়ে তাঁর যে জোরালো আপত্তি ছিল, তা উনি এক অভিনব আখ্যান কৌশল বা narrative strategy র মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

**আখ্যান কৌশল: পার্টি সম্পর্কে নীরবতা ও মেয়েদের কোলাজ**

আমার মনে হয়, মেয়েদের প্রতি মহিলা নেতৃত্বের প্রতি পার্টির বৈষম্যের কথা কখনও কখনও সরাসরি উল্লেখ করেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মণিকুন্তলা তাঁর নিজস্ব নারীবাদী ধ্যান-ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য কিছু আখ্যান কৌশলের (narrative strategy) সাহায্য নিয়েছেন এবং এই কৌশলের সাহায্যেই পরবর্তী কালের গবেষকদের কাছে কিছু সূত্র ছেড়ে গিয়েছেন যা আমি এই অধ্যায়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে লেখার মধ্যে উনি যে একটি স্পষ্ট লিঙ্গ-প্রেক্ষিত আনার চেষ্টা করেছেন তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মূল পার্টি ও তার সংগঠন নিয়ে ওঁর চোখে পড়ার মতো নীরবতা। উনি প্রথমে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির ও পরে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির যেমন নেত্রী ছিলেন, তেমনই কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পার্টির রাজ্য কমিটিরও সদস্য ছিলেন। পাঁচের দশকে একবার রাজ্য পার্টির সর্ব্বোচ্চ কমিটি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও হয়েছিলেন। অর্থাৎ শুধু মহিলা সংগঠন নয়, পার্টিরও একজন গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী ছিলেন উনি। কিন্তু পার্টি লাইন নিয়ে *সেদিনের কথা-*র দু একটি অধ্যায়ে ওঁর মন্তব্য বা মতামত থাকলেও, পার্টির রোজকার কার্যকলাপ, অন্যান্য পার্টির পুরুষ নেতাদের সঙ্গে ওঁর আদানপ্রদান, বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে পার্টির পুরুষ নেতাদের সঙ্গে ওঁর কথোপকথন, এই সব নিয়ে মণিকুন্তলা খুব কম সময়ই লিখেছেন। গোটা বইতে বিভিন্ন অধ্যায়ে নানান জেলার মেয়েদের গল্প, তাদের সাধারণ মেয়ে থেকে নেত্রী হয়ে ওঠার কাহিনী লিখে গেছেন, লিখেছেন আত্মরক্ষা সমিতি ও পরে মহিলা সমিতির বড়ো হয়ে ওঠার কাহিনী। কিন্তু মূল পার্টির কথা, সেখানকার মিটিং-এর কথা খুব কম অধ্যায়েই এসেছে। বিশ্বনাথ মুখার্জী, জ্যোতি বসু, পি সি যোশী, মণি সিং প্রমুখ কিছু নেতৃত্বে থাকা কমরেড আর কালীঘাটের নির্বাচনের সময় সুব্রত সেন শর্মা, রাজ্যেশ্বর নিয়োগী এরকম কিছু নেতার নাম ছাড়া পুরুষ নেতৃত্ব প্রায় অনুপস্থিত।

এর নীরবতার ব্যাখ্যা হয়তো অনেকে অনেক ভাবে করবেন। তবে আমার মনে হয় এর একটা ব্যাখ্যা হল যে মণিকুন্তলা পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হলেও এই সদস্যপদ ছিল খানিকটা আনুষ্ঠানিক। মহিলাদের মধ্যে কাউকে একটা নিতেই হবে বা রাজ্য কমিটিতে মহিলা সমিতি-র প্রতিনিধিত্ব দরকার এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে মূল পার্টি নেতৃত্ব মণিকুন্তলা সেনকে রাজ্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেখানে ওঁকে সেরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হয়নি, কেবলমাত্র মহিলা সংগঠনের মধ্যেই ওঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। পার্টির মূল নীতি নির্ধারণে, বা পার্টির কর্মসূচি নির্ধারণে ওঁকে তেমন ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হয়নি। তাই যে ক্ষেত্রে ওঁর ভূমিকা একমাত্র গুরুত্ব পেয়েছে, অর্থাৎ মহিলা সংগঠন তৈরি ও তার বিস্তার, উনি সেখানেই নিজের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। *সেদিনের* *কথা*-তেও উনি তাই কেবল এই বিষয়েই আলোচনা করছেন।

এই ব্যাখ্যার বৈধতা নিয়ে কারো মনে প্রশ্ন থাকতেই পারে। অনেকে মনে করতে পারেন যে পার্টির রাজ্য কমিটিতে ওঁর অন্তর্ভুক্তি কেবল আনুষ্ঠানিক ছিল না। উনি সেখানেও সক্রিয় ও যথাযথ ভূমিকা পালন করতেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে তাই যদি হয় কেন উনি সারা বইতে কেবলমাত্র বিভিন্ন জেলার মেয়েদের কথা লিখলেন। তারা কেউ পরবর্তীকালে মহিলা সমিতির নেত্রী হয়েছেন, কেউ বা প্রান্তিক ভাবে যুক্ত থেকেছেন সংগঠনের সঙ্গে। বিভিন্ন জেলায় সংগঠন তৈরির কাজে গিয়ে যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের যেন কোলাজ আঁকার চেষ্টা করেছেন *সেদিনের কথা* জুড়ে। ভূমিকায় মণিকুন্তলা লিখেছেন, *সেদিনের কথা* যে ঠিক সময়ে শেষ করা যায়নি তার অন্যতম কারণ ছিল তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য। লিখছেন,

অবশেষে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ১৯৭৯ সনের কোন এক সময়ে লিখতে শুরু করলাম এই বই — ‘সেদিনের কথা’। কিন্তু কিছুটা লেখার পর আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য আর অগ্রসর হতে পারিনি।16

জলি কলের লেখা থেকেও মণিকুন্তলার দূরারোগ্য রোগের কথা জানা যায়।17 বলা বাহুল্য সেই অশক্ত অসুস্থ শরীরে অতীত খুঁড়ে এত মহিলা চরিত্রকে মনে রেখে তাঁদের কথা বিশদে লেখা খুব একটা সহজ হয়নি মণিকুন্তলার। অথচ *সেদিনের কথা-*র বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য, অগুনতি মহিলা চরিত্র পড়লে মনে হয় উনি যেন সচেতন ভাবে চেষ্টা করেছেন কাউকেই বাদ না দিতে।

কার কথা লেখেননি মণিকুন্তলা! বরিশালের প্রবাদপ্রতিম মনোরমা মাসিমা18 থেকে বর্ধমানের পারিবারিক পর্দা প্রথা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা রাবেয়া ও মাকসুদা।19 মেদিনীপুরের তমলুকের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুচরিতা দাস20 থেকে ওই জেলারই এক অখ্যাত গ্রামের নাম না জানা ছয়-সাত বছরেরে বালিকা বধূ, ঘোমটা ঢাকা অবস্থাতেও যে স্লোগান দেয় “খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই, শিশুদের দুধ চাই”।21 হাওড়ার আশা সামন্ত, সুরুচি দেবী,22 বাঁকুড়ার দুই বোন ভক্তি ও মুক্তি সেন,23 পার্কসার্কাসের বৃদ্ধা লীলা বসু,24 পাবনার বাল বিধবা মায়া মিত্র,25 এরকম নানা বয়সের, সমাজের নানান অংশের মেয়েদের জীবন সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন মণিকুন্তলা এক একটি অধ্যায়ে। সমিতি গড়ে তোলার কাজে যে যে জেলায় উনি গিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেই সেই জেলার মেয়েদের নামগুলো উল্লেখ করে রাখতে, লিখেছেন তাদের বীরগাথা, প্রতিরোধের কাহিনী। জানাতে ভোলেননি কত কষ্ট করে, কত প্রতিরোধ তৈরি করে, কত সামাজিক নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এঁরা বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়েছেন, পার্টির কাজে এসেছেন। পার্টি তৈরি করেছেন।

মূল পার্টির কথা ও সেখানকার পুরুষ কমরেডদের প্রসঙ্গে প্রায় নীরব থেকে জেলায় জেলায় কেবলমাত্র মেয়েদের জীবন সংগ্রাম ও পার্টি তৈরিতে তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করা আমার মনে হয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে, প্রথমত, নিজেকে নারীবাদী দাবি না করলেও খুবই নীরবে নিজের অগ্রাধিকার পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন। আর দ্বিতীয়ত, ওঁর হয়তো আশঙ্কা ছিল যে পার্টির ছেলেদের কথা লেখার অনেক লোক থাকবে, কিন্তু মেয়েদের কথা উনি লিখে না গেলে হয়তো পার্টির ‘সরকারি’ ইতিহাস কথনে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা নাম না জানা নারী কর্মীদের কাহিনী অনুল্লিখিত, অনুচ্চারিতই থেকে যাবে। তাই যে পার্টি আজ এত বড়ো হয়েছে তার পিছনে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা হাজার হাজার মহিলার অবদান, তাঁদের আত্মত্যাগের কথা উত্তরকালের পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক দায় থেকেও উনি তাঁর স্মৃতিচারণে শ্রেণি সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিভিন্ন মেয়েদের জীবন ও আন্দোলনের একটি ঠাসবুনন রচনা করেছেন। সারা বই জুড়ে বিভিন্ন মহিলা চরিত্রের এই কোলাজ সৃষ্টি, আমার মতে তাঁর অন্যতম আখ্যান কৌশল, যা সাদামাটা বর্ণনা অতিক্রম করে তাঁর আখ্যানকে একটি অনুচ্চকিত নারীবাদী প্রেক্ষিত ও বুহুমুখী অর্থ (multiple meaning) প্রদান করেছে।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১। মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২

পৃ ৩০৯

২। পি সি যোশী: কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫১ সালে পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র ‘নিউ এজ’-এর সম্পাদক হন। স্বাধীনতার পর বি টি রণদিভের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়’ ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেয়। সেই সময় পি সি জোশী নেহেরু সরকারের সঙ্গে সহায়তা করার পক্ষে ছিলেন। প্রধানত পার্টির ভিতর এই মতাদর্শের লড়াইয়ের কারণে ১৯৪৯ সালে ওঁকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। ১৯৫১ সালে আবার যোশীকে ফিরিয়ে নেওয় হয়। বিশদ বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে, Gargi Chakravartty, *P.C. Joshi, A Biography*, New Delhi: National Book Trust, 2007

৩। মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, পৃ ১৪৭

৪। আলেকজান্দ্রা কোলনতাই: (১৮৭২-১৯৫২) রাশিয়ার বিখ্যাত বলশেভিক নেত্রী। ১৯০৬ সালে মেনশেভিক অংশে যোগদান করলেও ১৯১৫ থেকে উনি পার্টির বলশেভিক অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেত্রী ছিলেন কোলনতাই। মহিলা শ্রমিকদের সংগঠিত করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কাজে ওঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে উনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। সেই সময় লেনিন, বুখারিন, ট্রটস্কির সঙ্গে একসাথে উনি পার্টি কর্মসূচী তৈরি করার কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পরে বলশেভিকরা ক্ষমতায় এলে উনি কমিসার ফর পাবলিক ওয়েলফেয়ার হয়েছিলেন। বিশের দশকে ওঁকে নরওয়েতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও যৌনতার নতুন নৈতিকতা নিয়ে ওঁর জোরালো বক্তব্যের জন্য পার্টির ভিতরে ও বাইরে ওঁকে নানান বিতর্কের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন Barbara Evans Clements, *Bolshevik Feminist: The Life of Aleksandra Kollontai,* Bloomington & London: Indiana University Press, 1979

৫। Alexandra Kollontai, *The Autobiography of a sexually Emancipated Communist Woman,*  p. 150

৬। Ibid.

৭। মনিকুন্তলা সেন,*সেদিনের কথা* ‘নিবেদন’, পৃষ্টার উল্লেখ নেই

৮। Jolly Mohan Kaul, *In Search of a Better World*, Kolkata: Samya, 2010 pp. 312- 317

৯। মনিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা* পৃ ৮১-৮৩

১০। তদেব পৃ ৯৯

১১। তদেব পৃ ১৩০

১২। তদেব পৃ ১২৯

১৩।তদেব পৃ ১০৩

১৪। তদেব পৃ ১০৪

১৫। তদেব পৃ ১২৩

১৬। তদেব পৃ ১০৯

১৭। Jolly Mohan Kaul, *In Search of a Better World*, pp. 312- 317

১৮। মনিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা* পৃ ৮১-৮৩

১৯। তদেব পৃ ৯৯

২০। তদেব পৃ ১৩০

২১।তদেব পৃ ১২৯

২২। তদেব পৃ ১০৩

২৩। তদেব পৃ ১০৪

২৪। তদেব পৃ ১২৩

২৫। তদেব পৃ ১০৯

জীবনানন্দ দাশ

কবিতার সত্য ও সময়ের সত্য

তরুণকুমার মৃধা

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনানন্দ আধুনিক কবি। আধুনিক কবির স্বরূপ বিশেষত্ব রূপে সময়ের সত্য তাঁর কবিতায় বিশেষ অন্তরধর্মে স্বীকৃত। সময়ের চলৎ প্রতিভাকে কাব্যসত্যের বিবরণে লেখেন " আমার কাব্যে সময় চেতনা একটি সঙ্গতিসাধক সত্যের মত।''১(পৃঃ ১০) কিন্তু এই সময়ের একান্ত বিভাস চেতনা কাব্যের একমাত্র সত্তা সত্য উপার্জন নয়। তাহলে এতো যুগ পরে বিনম্র আবেদনে কালিদাস বেঁচে থাকত না, বেঁচে থাকত না শেক্সপীয়র। তাঁরা কোন বিশেষকে নির্বিশেষ রূপে কবিতায় প্রজ্ঞা দিতে তৎপর হয় নি; বা কোন কাল বা দায়কে কবিতায় বদ্ধ করবার অনুজ্ঞায় রত ছিলেন না। তাঁরা বেঁচে আছেন সৃষ্টির অনপেত লীলায়- আনন্দ সৃজনের নিঃসীম দায়ে। কিন্তু সে দায় আবার কোন চরম মূল্য প্রাপ্তির তাগিদ নয়, তাগিদ বস্তু অভিজ্ঞতার শিহরণ রাশিকে চিত্তলীলার অনুভব দীপ্ত শিহরে মনোময় গহনতায় সমাজে পৌঁছে দেবার মাখামাখিতে। বস্তু ও সময়ের অভিজ্ঞতা এমন পরিমিত প্রাণতায় কবিতার অন্তরগর্ভ পূর্ণ করে থাকবে যে কবিতায় সেই সময়ের পদচিহ্নটাই শুদ্ধ বলতে চেয়েছে এমন আহাম্মকিতে ভারাক্রান্ত হলে হবে না। তাঁকে হতে হবে মানব জ্ঞানের সর্বার্থ পরম অভিসারে। প্রতিভার মোহশুদ্ধ বিজনতায়। নতুবা তা শুদ্ধ সময়ের বিন্যাস দলিল মাত্র, একজন প্রতিভময় পদ্যকারের সৃষ্টি –স্বর্গ রুপে। সময় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কবিপ্রাণের নিঃসার আলো মিশিয়ে মোহ অবলুপ্ত নীলিমায় শব্দ, অর্থের অলঙ্কারের শিরধার্যে, হয়ত বা তাও নয়; কবিপ্রাণের সহজ উৎসারণ আলোয় অন্তর্জলি যাত্রায় – কবিতার অবয়ব বঁধুর সঙ্গে পরমাত্মকল্পে, হর-গৌরীর নিত্য সম্পর্কের অনবদ্য শিহরণ সমীকরণের মত বা ঈর্ষণীয় মাধুর্য নিয়ে শব্দ অর্থের দ্যোতনায়। ( তবেই কবিতায় সময়ের দর্পণ সার্থককল্প প্রতিভাস, অবলেপ স্বাক্ষর হল বলা যাবে।) কোন চিন্তা মনন সিন্ধান্তের অনুকল্পে নয় –তাহলে তা হবে না কবিতা, হবে বস্তু অভিজ্ঞানের সারজ্ঞান নিয়ে চেতনার একটু বিশেষ রকমের ভাস্বরতা, বিপিনতা। কবিতাবঁধু তো পরকীয়া বধূ মাধুর্য কল্প। তাকে ছুঁয়েও ছোঁয়া যায় না। কবি চেতনার জায়মানতায় সে পরকীয়া। তাই, তার প্রতি আবেগে মনোময় ভালবাসা নিঃসরিত হয়। সময় ও অভিজ্ঞতাকে থাকতে হবে এই পরকীয় প্রতিকল্পে; পরমীয় অবভাসের সন্তরণ আলোয়। কবি থাকে পিছনে, সামনে থাকে কবির পরাময় বঁধু –আলো – বিপিনতা। সময়ের পদচিহ্ন থাকে সেই আলোর অতলে, কিছুটা ধারকের মত, কিছুটা বিকাশতীর্থের আলোয়- প্রকাশময়তায়, ঐশ্বর্যে। তাই জীবনানন্দ বলেন কবিতায় কোন মূল্যজীবিতার প্রার্থনা ব্যর্থ আলোর সঙ্গত প্রার্থনা। কবিতা তা যদি দেয় সে ভাল, মানুষের প্রদেশ বিভায় নৈর্ব্যক্তিক মহাকরণে। কিন্তু কবির অন্তর উৎসর্গের নক্ষত্র প্রতিম বিভাস চেতনায় কবিতায় যে মনোময় প্রাপ্তি, কবির আনন্দকিরণের যে বাণী উৎসব সেই মহৎ;--( কবিকর্মের এই মানস উৎসারই কবিতা।) কবির অনির্বচনীয় বিভা কিরণে, কবিপ্রাণের বিকাশতীর্থের গরিমায়- কবি প্রতিভার চন্দ্রালোকিত সৌকর্যে কাব্য সৃষ্টি- কবিপ্রেমের সর্বার্থ লীলা মোহ- তবেই কল্পনার চিন্তা ঐশ্বর্যে কবিতার বস্তু অভিজ্ঞান মুক্তি পাবে।

কিন্তু কবিতার মহৎ প্রাপ্তি অর্থে রামায়ন মহাভারত গীতা উপদেশের কথা নয়। মহাভারত গীতা রামায়ণ এসব কবিতা বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। আধুনিক কবিতায় কবির বস্তু অভিজ্ঞান থাকবে কবির মনোদর্পণের সঞ্চয়ন সরসে, গীতা উপদেশের মতন অমন প্রজ্ঞাময় উপমায় নয়। কবিতা জীবন ও অভিজ্ঞতার , কল্পনা ও মনীষার এক শান্ত বোধ। যা পাঠকের ইমাজিনেশনকে তৃপ্তি দেয়, পাঠকের ইমাজিনেশনকে তৃপ্ত করে। "ইতিহাস বিজ্ঞানে মানব জ্ঞানের জগত ও জীবনের বস্তুরাশির সুপরিসর অপরিমেয়তা কম নয়, কিন্তু পাঠকের তৃপ্তি আস্বাদন সেখানে কম। সেখানে পাঠকের শ্রান্ত মন বিশ্রাম পায় না।" (পৃঃ-২৪)।

কোন মানব ভুবনের অতিসার আলোয় - সোনার কাঠির ছোঁয়ায় – চিত্তের অতল অসীম প্রদেশে – যেখানে চিত্তের শান্ত বিশ্রাম –মানবের চির আকাঙ্খিত সত্তা বিশ্রাম পায়, অন্য কোন পার্থিব সমিধ তেমন করে যা দিতে পারে না, তাই কবিতা। কবিতা তাই জীবনশীল, প্রজনন্ময়, নিরন্তর আভায়িত, অববহিত সম্পদ। শেক্সপীয়র কালিদাস যে কারণে বেঁচে আছেন, জীবনানন্দ লিখছেন -

" কবিতা ও জীবন একই জিনিষের দুই রকম উৎসারণ ; জীবন বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে মানুষের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে যা আমরা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুণর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না।; আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায় – তাহলে এই পৃথিবীর এই দিন রাত্রি মানুষ ও তার আকাঙ্খা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যা পারে যা কাব্য; - অথচ জীবনের সঙ্গে যার এক গোপনীয় সুড়ঙ্গ লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ; সম্বন্ধের ইঙ্গিত ধূসরতা ও নবীনতা।৩ (পৃঃ ১৩-১৪)

সুতরাং কবিতা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অভিজ্ঞতার প্রত্যয়কে বিশ্বস্ত রেখে এক নতুন বস্তু; চেতনার মনোরথের অবিকৃত বিস্ময়। – কবির চেতনার অপার আলোর বৈধতায় এবং না বৈধতায়, কবির বিস্ময়ের বোধ কল্পনার স্বয়ংভূত প্রজ্ঞায় সৃষ্টির ভিতর এক নতুন কল্পনা। সৃষ্টির ভিতর নতুন কল্পনা, নতুন শব্দ অভিজ্ঞতার সৃজন হয়েই পাঠকের কল্পনাকে তৃপ্তি, শান্ত মনোরথ দেয়।

"নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তু-সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেনও হৃদয়ের ভিতরে; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে, যেন সুরের জন্ম হয় – কাব্য জন্ম লাভ করে। - মানুষের কল্পনা মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে।৪" (পৃঃ- ১৪)

সুতরাং আধুনিক কবিতা সময় অভিজ্ঞতার নিঃশব্দ পদচারণায় কবিতার অন্তর সৌধে ব্যথিত নিরন্তরতা। সময়ের স্পর্শের ব্যঞ্জনায় সার্থক সময় অভিজ্ঞতার কবির জারণ মননময় চয়ন আধুনিক কবিতা, বা কবিতার শ্রেষ্ঠ মানবায়িত চয়ন। সকল মানবের বিবেক যাতে শিক্ষা পায়, তৃপ্তি পায়, সৌন্দর্যে আস্বাদিত হ'য়ে ওঠে। আধুনিক কবিতা সময়ের বস্তু রাশিকে কবির চেতনার স্পর্শের ব্যঞ্জনায় উৎসারিত হয়ে সার্থকোপম সময় নিঃসরণ। বস্তু জ্ঞানের নবতর সুরের আস্বাদে কবিতায় আত্মচৈতন্য কাব্যাত্মা সৃজন করে কবিও তৃপ্তি পান, তৃপ্তি লাভ করেন পাঠক। শ্রেষ্ঠ কবিতার কাজ এই বা কবিতার প্রথম ও শেষ উপাত্ত পাঠকের অনুভুতিতে সাড়া দেওয়া, তৃপ্ত করা।তাকে লোক শিক্ষায় নিয়োজিত করবার দায় কোন কবির নয়। কবিতা লোক শিক্ষক হতে পারে, কিন্তু তা মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভুতিগুলিকে সুসীম আনন্দের দিকে পল্লবিত করে, সৌন্দর্য গরিমার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষে। কবিতা কল্পনার ভিতর মানুষের অনুভূতিগুলি তৃপ্তি পেলে স্বতোচ্চারিত কল্পে – মানুষের অসূয়া বোধগুলিকে জারিত করে বিবেকে সম্প্রসারিত করে দিতে পারলে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগত মূল্য বা কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল বলা যাবে। জীবনানন্দ লেখেন তাই-

" হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন, কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মত নয়; যা উদ্‌ঘাটিত হল আসবে সৌন্দর্যের রূপে আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে, যদি তা না দেয় তাহলে উদ্‌ঘাটিত সিন্ধান্ত হয়ত পুরনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিম্বা হয়ত নতুন কোন চিন্তাও –যা হবার সম্ভবনাও নেই বললেই চলে, কিন্তু তবু তা কবিতা হল না, হল মনোবীজ রাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন পুরনোর ভিতরে সেই নতুন কিম্বা সেই নতুন সজীব যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল।(পৃঃ ১০-১১)

কবির শিল্প প্রতিভার সফলতা একমাত্র শিল্পের দেশেই; শিল্পের দেশেই তাঁকে সার্থক হতে হবে। মানুষের অনুভূতি কল্পনাকে বৃহত্তর সুসীম আনন্দের দিকে অভিসারী করে, শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনার কাজ। শিল্প প্রতিভার পরিমিতি কোন রাজনীতি দর্শন সমাজনীতির সঙ্গোপন সুধায় নয়, তাকে খুঁজতে হবে শিল্পের দেশেই শিল্পের কারক হিসেবে। জীবনানন্দ লেখেন তাই --

''অন্য সমস্ত প্রতিভার মত কবি প্রতিভার কাছে শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হবার সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাঁকে খুঁজতে হবে ; সেখানে কোন রাজনীতির আশ্রয় নেই; নেই দর্শনের আশ্রয় বা সিন্ধান্ত বা কোন সমাজ ধর্মনীতি; .........।এই সব জিনিসই থাকবে কিন্তু তা সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের অভিজ্ঞানে।"(পৃঃ ৩০)

সৌন্দর্য সৃষ্টির পরাজ্ঞানে কবির হৃদয় বিশ্বস্ত হওয়াই জরুরী - সেটাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দীপ্তি সিদ্ধি। সেই সিদ্ধতায় পাঠকের কাছে শ্রেষ্ঠ হল কিনা- এই ব্যক্তি উষ্মার, মোহ জড়িমায় কবি বদ্ধ নয়। কবির নিজের প্রতিভার কাছে স্বীকৃতি পেলে, প্রতিভার দীপ্তি স্বতোত্সারিত নীলিমায় লালিত পল্লবতা পেলে, সেখানে পাঠকের ইন্দ্রিয়লুপ্তির কারণ। কবির নিজের প্রতিভার কাছে কবি বিশ্বস্ত হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতারাজির উদ্ভব হয়। প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাবিন্দুর পরম উৎসার আলোয় ঐসব মূল্যজীবি জ্ঞান, রাজনীতি দর্শনকে তত্ত্বকে পরিজ্ঞাত বিভা দিতে হবে। এসবকে গ্রহণ করবার অবকাশ আছে কবির নিজ সত্তার উন্মীলন পরিচর্যায় -নান্দনিক মহার্ঘতায়, কোন অর্থকামী বাস্তবতার মূল্যে নয়। নয়ত কবিতার শিল্পগত মূল্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যেমন করে সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুলে মূল্যচেতনা, নীতিজ্ঞান বা বিবেকীচেতনা বলবান, কিন্তু তা শিল্পে আরোপিত জ্ঞান কলঙ্ক হিসেবে; সম্পূর্ণত প্রতিভার উৎসার বিপিন উত্তরণ সীমার প্রান্তে নয়। ফলে তা জ্ঞানের মহল হিসেবে পর্যবেক্ষণশীল যতটা ততটা সৌন্দর্যের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানে নয়। নীতি বা জ্ঞানকে পর্যাপ্ত করে নেবার দায়িত্ব আছে শিল্প সঙ্গমে প্রেয়সীর মত দীপ্তিতে; কোন নীতি দাতা বা উপদেশদাতার বিভায় নয়। সময়ের নিরবধিকে নিরবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞায় কাব্যে ধরা দিতে গেলে তা কাব্যের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞানের সরসতা ভিন্ন কিছু নয়। সময়কে মহাবিশ্বলোকের ইশারায়, প্রতিভার চলৎপ্রতিভায় কবি মনের মহৎ চিত্ত অর্ঘ্যে চৈতন্যময় করা শিল্প জ্ঞানের সার্থক গরিমা। কবির আন্তরাণবিক চিত্ত ঐশ্বর্যে বস্তুকে বিভা দিতে হবে শব্দ ছন্দ অলঙ্কার কল্পনায়। ভাবের ঐশ্বর্য স্বর্গের প্রাণ আলোয় বস্তুর ঐশ্বর্য স্বর্গের, বস্তু জ্ঞানের চেতনা মনোময় চৈতন্যে কাব্যের সারৎসার অনুকল্পে প্রেয়সীর মত আলো ছড়াবে।\* কাব্য তখনই কেবল বেদনা মাধুরী ঘন। জীবনানন্দের কাছে তাই শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গা--

''শ্রেষ্ঠ কবিতা অন্য যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পের মত কবি মানসের আপন অভিজ্ঞতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিঃস্বার্থ জিনিস।৮''(পৃঃ ৩০)

সার্থক কবিতায় কবির এই আত্মচৈতন্য সৃজন হয় বলেই কবিতা কবির শ্রেষ্ঠ আনন্দ সৃজন।

**টীকা ও তথ্য কথা**

জীবনানন্দ তাঁর '**কবিতার কথা'** গ্রন্থে কবিতার তত্ত্ব সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের সমাধান সমালোচনা করেছেন। মূলত, এই সমালোচনা একজন কবির, স্রষ্টার দর্শন; সৃষ্টির তত্ত্ব ব্যাখায় স্রষ্টার দর্শন। স্রষ্টার তরফ থেকে সৃষ্টির লীলা রহস্য যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন সে ব্যাখ্যায় স্রষ্টার কল্পনা অনুভূতির ছাপ থাকে; এবং তিনি যদি কবি হন তবে সেই ব্যাখ্যায় কবিত্বের প্রজ্ঞা অনুভূতিগুলি দানা বাঁধে; সেই সমালোচনা কবিত্বের মহৎ বিশেষত্বে সঞ্চিত প্রজ্ঞ হবে। এ আলোচনায় কবির সেই বিভাকে পরিচয় দেবার প্রয়াস। এ আলোচনায় সর্বত্র জীবনানন্দের কবিতার কথা' গ্রন্থের সিগনেট সংস্করণ ১৪০৫ কে অনুসরণ করা হয়েছে। 'কবিতার কথা; জীবনানন্দ দাশ

পত্র-সাহিত্য : কী, কেন কিন্তু আর কতকাল ?

ড. আকাশ বিশ্বাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ

এখনও স্টেশনগুলি’র হুইলারগুলিতে শরৎচন্দ্রের ‘দেনাপাওনা’, ‘দেবদাস’, রবি ঠাকুরের ‘চোখের বালি’র পাশাপাশি দৈনিক খবরের কাগজের মতো ইংরেজিতে অফিসিয়াল মেড ইজিও দেখি দিব্যি বিক্রি হয়। অথচ যে বইটা পেয়েছিলাম মামাবাড়ির বুকসেলফ্ এর এক কোণে ; সেই ‘*যাও পাখি বলো তারে / সে যেন ভুলে না মোরে* ’, সেই বইগুলি কোথায় গেল! তার মানে এখন না পাওয়া গেলেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে নিশ্চিত এই বইয়ের চাহিদা ছিল। তবে আমার মা-মাসি-মামাদের মধ্যে কে ছিলেন বইটির আদি অধিকর্তা তা জানার উপায় ছিল না; মালিকের কোনো স্বাক্ষর ছিল না বলে। কেননা অত বছর আগে ওহেন সচিত্র প্রেমপত্র রচনার শিক্ষামূলক বইয়ে হস্তাক্ষর খোদাই করে রাখার মতো বুকের পাটা শুধু বাঙালি কেন কোনো ভারতীয় যুবক-যুবতীরই ছিল বলে মনে হয় না । কিন্তু প্রয়োজন ছিল বইগুলির। কারণ ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ই-মেল , অর্কুট , ফেসবুক ,হোয়াটস্অ্যাপ কিছুই ছিল না যে। আজকের সাল্লুভাই ওরফে সালমন খানের প্রথম সিনেমার নায়িকা ভাগ্যশ্রীকেও চিঠি লিখে পায়রার পায়ে বেঁধে পাঠাতে হয়েছিল ‘কবুতর যা যা যা ...’ গান গেয়ে-গেয়ে। সেই সালমন বুড়ো হলেন না এখনও, অথচ চিঠির সেই সোনার খাঁচার দিনগুলি চড়ুই পাখির মতো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল কখন ! আজকের প্রজন্মের কোনো উপায় নেই রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবের কথা বোঝার , যেখানে তিনি বলেছিলেন : ‘ যারা ভাল চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে বসে আলাপ করে যায়—তার কোন ভাব নেই,স্রোত আছে । ভাবহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।’ (পথে ও পথের প্রান্তে)

আজকে শুধু মন্দভাগ্যে উচ্চতর শিক্ষায় সাহিত্য (পড়ুন বাংলা) পড়তে আসা ছেলে-মেয়েদেরকেই পাঠ্যসূচিভুক্ত ‘সাহিত্যের রূপভেদ’ অংশে বাধ্য হয়ে পড়তে হচ্ছে ‘পত্র-সাহিত্য’ কী,কেন; ইত্যাদি-ইত্যাদি। বাধ্য হয়েই সে মুখস্ত করছে : পত্র-সাহিত্যকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ১। বৈষয়িক ২। প্রণয়মূলক বা প্রেম-পত্র ও ৩। অনুভূতি বা ভাবপ্রধান পত্র। অথচ বাস্তবজীবনে এই শিক্ষার বিন্দুবৎ উপযোগিতাও যন্ত্রসভ্যতা তার জন্য অবশিষ্ট রাখেনি। তবু বাধ্যতাবশত হলেও,এহেন তাত্ত্বিক বিষয়ের নাড়াচাড়ার অবকাশেই সে যখন জানে—প্রথম ইংরাজিউপন্যাস (যা আবার পত্র-উপন্যাসও বটে) ‘পামেলা’ লেখা হওয়ার পেছনে রচয়িতা রিচার্ডসনের ব্যক্তিজীবনের গল্প; তখন সে অন্তত হাসির বা রূপকথার গল্প পড়ার মজাটা পায় ভাগ্যিস !

ভাবা যায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসিক একজন পেশাদার পত্রলেখক ছিলেন আদতে ! তাও আবার ডাকঘর বা সরকারি ভবনের সামনের ফুটপাথে বসে থাকা কলমচি নন ! পেশাদারি পত্রলেখক বলতে একেবারেই অফিস-আদালতের ফরমায়েশি চিঠির নন , ফরমায়েশি তবে কিনা প্রেম-পত্রের ! পাড়ার অশিক্ষিত চাকরানির দল তাঁর কাছে আসত প্রেমপত্র লেখাতে। আর এইসব চিঠি লিখতে-লিখতেই রিচার্ডসনের মনে ইচ্ছে জেগেছিল একখানি আদর্শ পত্ররচনা পদ্ধতি প্রণয়নের। আর এই ইচ্ছের চরিতার্থতার নিমিত্ত অবতারণা ঘটল জনৈকা কাল্পনিক দাসীচরিত্র পামেলার। আখ্যান রচিত হল—পামেলা ধনী মনিবের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রেমে পড়ে তার অবস্থার কথা লিখে জানাচ্ছে বান্ধবীকে। আর সেই ঘটনাচক্রেই রচিত হয়েছিল প্রথম ইংরেজি উপন্যাস ‘পামেলা’।

কিন্তু এও তো সেদিনকার কথা। চিঠি লেখায় যে ইতিহাস ;তার সাপেক্ষে। কেননা মানুষ যখন প্রথম লিপি আবিষ্কার করেছে সম্ভবত তখন থেকেই চিঠি লেখা শুরু করেছে। রামায়ণ,মহাভারত, গ্রিকপুরাণ;কোথায় নেই চিঠির কথা ! মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে দময়ন্তী হাসের পায়ে বেঁধে নলরাজাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল। আবার গদ্যসাহিত্যের আঁতুড়ঘরও যে চিঠি ; তাও সকলে জানে। রাজা-ভূস্বামীদের লিখিত পত্রের সৌজন্যে সেই সময়ের ইতিহাস তথা ভাষার চেহারা জানতে পারা যায়। কিন্তু সে সব চিঠি ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি বা তার প্রয়োজনও ছিল না ।‘পত্র-সাহিত্য’ বিষয়টি এসব কেজো চিঠির থেকে স্বতন্ত্র।

আবার পত্র-সাহিত্যও তো ভেঙেছে কত ভাবে ! কখনো চিঠির শৈলীকে ব্যবহার করে উপন্যাসের প্লট সাজানো হয়েছে বলে সমালোচক তার নামকরণ করেছেন ‘পত্রোপন্যাস’ বা Epistolary Novel আবার কখনো চিঠিতে রীতিমতো পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের সন্ধান পেয়ে নাম দিয়েছেন পত্র-প্রবন্ধ। এছাড়াও পত্র-কবিতা মায় ব্যক্তিগত আলাপচারিতার চিঠিপত্রের সংকলন-এর মতো কতভাবেই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে সে! অধুনা পকেটের মোবাইলটির মতোই এই সেদিন পর্যন্তও তো চিঠি আমাদের নিত্যদিনের বেঁচে থাকার একটি অপরিহার্য শর্তই ছিল। অতি প্রয়োজন ছাড়া টরে-টক্কা-টরে-টক্কা-টক্কা-টরে-টক্কা-টরে সুলভ টেলিগ্রাফিক আওয়াজের কাছে আশ্রয় নেবার কোনো প্রশ্নই উঠত না। সাধে কী আর কবি লিখিয়াছিলেন :

*কত চিঠি লেখে লোকে—*

*কত সুখে , প্রেমে,আবেগে, স্মৃতিতে,কত দুঃখে ও শোকে!*

সব ক্ষেত্রে অর্থমূল্যে না হলেও ভালো চিঠি-লিখিয়ের কত সুনাম তখন ! প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক কত বড়ো মুখ করে বলেছিলেন যে, *Great letter-writers are suppressed novelist ,frustrated essayists born before their time*। আবার শুধু কী তাই ! ইতিহাস সাক্ষী কিটসের চিঠির সংকলন করতে বসে—তাঁকে কবির চেয়ে অনেক বড়ো চিঠি-লিখিয়ে বলেও সাবস্ত করতে কসুর করেননি সংকলক। এসব নিয়ে বিতর্কও জমেছিল বিস্তর। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়েও বোধহয় এহেন বিতর্ক জমিয়ে তোলা যেতো ; যদি মিলত তেমনতর পত্র-প্রেমী সমালোচক। কম চিঠি তো লেখেননি মানুষটা ! চিঠিপত্রের সঙ্কলনের খণ্ড তাঁর মূল রচনাবলীর চেয়ে সংখ্যায় বেশি। আবার তাঁর চিঠিপত্রেরও যেন স্পষ্টই দু’টি বিভাগ—এক ধরণের চিঠি ;যখনও তিনি পুরোপুরি ‘রবীন্দ্রনাথ’ হয়ে ওঠেননি,লিখছেন প্রিয় কোনো পরমাত্মীয়কে যেমন ‘ছিন্নপত্র’ বা ‘ছিন্নপত্রাবলী’, আর অন্য এক ধরনের চিঠি বলতে ;যখন তিনি পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথ; জানেন তাঁর এই সব চিঠিও সংগৃহীত হবে মহাকালের জন্য,যখন তাঁর আর কোনো চিঠিই ব্যক্তিগত চিঠি নয় আদতে, যেমন ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ , ‘জাপান যাত্রী’, ‘রাশিয়ার চিঠি’ প্রভৃতি। এগুলো সব যেন আদতে চিঠির আকারে লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। ঐতিহাসিকভাবে প্রাপক হয়তো কেউ একজন,কিন্তু তা উপলক্ষ্য মাত্র। এসব চিঠি আবিশ্বের সকল অক্ষরপ্রেমীর উদ্দেশ্যেই লেখা। আবার একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও কেমন করে কোনো চিঠি হয়ে ওঠে সকলের,কেমন করে বিশেষ একটি দিন বা মুহূর্তের ব্যক্তিমনের অভিপ্রায়—ছুঁতে পারে অনাদি ,অনন্ত কালের একেবারে অপরিচিত পাঠকেও,তারও অন্যতম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা অসংখ্য ছিন্নপত্রাবলী;যার কিছুটা হয়তো এখনও রয়ে গেছে আবিষ্কারের অপেক্ষায়,অগোচরে।

তাছাড়া শুধু কী রবীন্দ্রনাথ! নিত্য দিন বই হয়ে অথবা কোনো লিটল্ ম্যাগাজিনে বা ফি বাৎসরিক পূজাবার্ষিকীতে কত কত মহাপুরুষের অপ্রকাশিত পত্রাবলীই তো ছাপা হয়ে চলেছে অবিরত। হয়তো অনন্তকাল ধরেই চালু থাকবে এই ধারা। হয়তো অনন্তকাল ধরেই উপন্যাস,ছোটোগল্প,নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যকার গল্প বলা মাধ্যমগুলিতে কাহিনির কোনো গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে থেকে যাবে কোনো চিঠির অপরিহার্য ভূমিকা! হয়তো ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের মতো চিঠির শৈলীতে কবিতা লেখাও চালু থাকবে! হয়তো শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘ক্রৌঞ্চমিথুন’, তরুণ ভাদুড়ী’র ‘সন্ধ্যাদীপের শিখা’, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘পোনুর চিঠি’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘প্রিয়তমাসু’র পরেও অন্য কোনো শক্তিমান লেখক পূরণ করবেন বাংলা ভাষায় আদর্শ পত্রোপন্যাস না থাকার শূন্যস্থান।

কিন্তু এ সবই তো হয়তো’র কথা। পত্রোপন্যাস-এর কথা ছেড়েই দিলাম। শেষ পাঁচ-দশ বছরে পড়া কোনো উপন্যাসের কাহিনিতে ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘বিষবৃক্ষ’ বা ‘চোখের বালি’র মতো কোনো অবধারিত প্রয়োজনে পত্রের উপস্থাপনা; অনন্ত আমার মতো দায়ে না পড়লে পড়াশুনা না করা মানুষের চোখে তো পড়েনি। শেষ কোন সিনেমায় ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর সেই ঐতিহাসিক প্রেম-পত্রটির মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ; কাহিনি অংশে কোনো চিঠি প্রসঙ্গ এসেছে ,তাও তো মনে পড়ে না ! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই আবৃত্তি-ধন্য ‘একটি না-পাঠানো চিঠি’র পর আর কোনো চিঠির শৈলীতে লেখা কবিতা; না মনে পড়ে না তা-ও। আসলে চিঠির দিন গিয়াছে।

অবশ্য শেষ হইয়াও কি শেষ হইয়াছে পুরোপুরি ? একটি ‘যদি’ কিন্তু আছে। আর সেই কথাটিকেও কিন্তু অবলীলায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার জো নেই । নিঃসন্দেহে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের আখ্যানে চিঠির প্রসঙ্গ থাকাটা একটু উটকো গোছের ব্যাপার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিস্তর। একই কারণে পত্রাকারে লেখা কবিতার জন্মও হয়তো আর তেমন করে সম্ভব নয়। যদি না কেউ পৌরাণিক ,ঐতিহাসিক মায় আশি-নব্বইয়ের সময়ের কোনো কাহিনি ভাঁজেন। কেননা শ্যাম পিত্রোদার ভারত আগমন ও তরুণতম প্রধানমন্ত্রীর দেশকে একুশ শতকের উপযুক্ত করে তোলার বাসনার ফলশ্রুতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে বিরাট বিপ্লবের সূচনা ঘটেছিল স্বদেশে,ঘরে-ঘরে ক্রমশ পৌঁছে যাচ্ছিল টেলিফোন,তখনই মৃত্যু ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল চিঠিপত্রের। আর মানবসমাজের থেকে বানপ্রস্থ নিয়েছে যে পদ্ধতি,দীর্ঘদিন সামাজিক প্রতিবিম্ব পর্যবেক্ষণের আন্যতম বিশুদ্ধ মাধ্যম সাহিত্য নামক শৈলীতে তার স্থান থাকাও অসম্ভব। চিঠিপত্রের সংস্কৃতির বিদায় আর সংস্কৃতির ময়দান থেকে চিঠিপত্রের প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস বা ক্রম অবসর ঘটেছে সময়ের শর্ত মেনেই। কিন্তু হার্ড কপি’র যুগ গেলেও সফট্ কপি’র চিঠির যে সাইক্লোন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে বিশ্ব জুড়ে ,তা কি জন্ম দেবে না নতুন কোনো সম্ভাবনার?

হয়তো দেবেও-বা! আজকে যা আপাত হাস্যকর লাগে, আগামী অনেক ক্ষেত্রেই তাকে সত্যি প্রমান করে দেয় বলেই একই কক্ষপথে ঘুরেও পৃথিবী এগোয়। কে বলতে পারে জীবনান্দের টিনের বাক্স খুলে যেমন এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অপ্রকাশিত কবিতা,চিঠিপত্র;আজকের কোনো সাহিত্যিকের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় ল্যাপটপটির হার্ড ডিস্ক ঘেঁটে কোনো মুছে দেওয়া কিন্তু অনন্ত সম্ভাবনাময় একটি চিঠি আবিষ্কার করবেন না ভবিষ্যতের কোনো ভূমেন্দ্র গূহ?কে বলতে পারে ই-মেল বা এস্. এম্ .এস্. সাহিত্য বলে কোনো রূপভেদ তৈরি হবে না ভবিষ্যতে?

আজি হতে শতবর্ষ পরে হয়তো সেদিনের সেই সাহিত্যধারা নিয়েও সেমিনার হবে ,লেখা-জোকা হবে পত্র-পত্রিকায়,হয়তো পাঠ্যসূচিতেও স্থান পেয়ে যাবে তা !যদিও জানি না অবশ্য;তখনও বাংলা ভাষাটা টিঁকে থাকবে কি না,সেদিনের সেই ‘বাঙালি’রা কোনোদিন শুনবে কি না কলকাতার কোনো এক নাগরিকার নবীন বয়সে রেকর্ড করা সেই গানটি : *আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম/রঙিন খামে যত্নে লেখা আমার নাম …!*

শুনলেও বিকেলের ডাকে বহু আকাক্ষিত চিঠিটি অবশেষে হাতে এসে পৌঁছনোর যে আনন্দ,যে শিহরণ, যে উদ্বেলতা,খামের উপর পরম যত্নে লেখা নিজের নাম দেখার যে মাধুর্য , মুগ্ধতা ,নিশ্চিন্তি,...শুধু অক্ষর ছুঁয়ে পাওয়া যে স্পর্শসুখ ; এসবের মানে তারা বোধহয় বুঝবে না!

সেকালের নিগড় ও একালের প্রতিশ্রুতি : ‘গণদেবতা’য় গণচেতনার নির্মিতি

নেহা চট্টোপাধ্যায়

গবেষক, জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ দিল্লী এবং সেন্টার ফর দি স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিস, দিল্লী

ইতিহাস অনু্সন্ধানের ক্ষেত্রে সাহিত্য উপাদানের গুরুত্ব প্রায় তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত। যে কোনও যুগের রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতির রূপান্তর সেই সমাজের মানুষ কীভাবে অনুভব করেছিল , সেই অভিজ্ঞতার সন্ধান মেলে সমকালীন গল্প-উপন্যাসে এবং এই অভিজ্ঞতার সন্ধান ব্যতিরেকে ইতিহাস-চর্চা নেহাৎ প্রাণহীন সনতারিখ-সম্বলিত ঘটনা-পরম্পরার সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। লেখক সমালোচকরাই একটি যুগের ভাবাবেগের ইতিহাস পুনরুদ্ধার-অভিযানে যথার্থ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন ১। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে ঐতিহাসিক-বাস্তবতা বহু আলোচিত এবং স্বীকৃত । বিশশতকের প্রথমার্থে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমতা ও মর্যাদার কাঠামোর বিন্যাসে পরিবর্তন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে জমির মালিকানা, জাতপাত, লিঙ্গ ও যৌনতা সম্পর্কিত নানান প্রশ্ন জড়িয়েছিল। সেই ঘটনা-পরম্পরা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস সম্মত ছবি তারাশঙ্কর গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে ‘গণদেবতা’(‘চণ্ডীমণ্ডপ’, ‘পঞ্চগ্রাম’ ও পরবর্তীকালে প্রকাশিত ‘দ্বারমণ্ডল’—এই তিনটি পর্বে রচিত) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের এই রূপান্তরপর্বে ভাবাবেগ-চিন্তাচেতনার যে নির্মিতি লেখক উপন্যাসে ঘটিয়েছেন তা কতখানি বাস্তবানুসারী সেটিই এই প্রবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭৮) জন্মস্থান বীরভূমের লাভপুর গ্রাম। তিনি কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার সময়েই দেখেছিলেন বাজার-অর্থনীতি কীভাবে ক্রমে-ক্রমে বংশানুক্রমিক পেশার ভিতকে ধ্বসিয়ে দিয়ে , জাতিবর্ণে বিভক্ত গ্রামসমাজে সামাজিক প্রতিপত্তি, ভূমির অধিকার ও যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করছে। উপন্যাসে ময়ূরাক্ষীর তীরে কঙ্কনা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই ‘পঞ্চগ্রামে’র সমাজজীবনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক যে মানচিত্রটি আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তবের লাভপুর সংলগ্ন এলাকার গ্রামীণ সমাজের সাদৃশ্য ছিল ২ । প্রশ্ন হ’ল ঊপন্যাসে সদ্ গোপ, কামার, ছুতোর, নাপিত, বাঊড়ী, বাগদী, মুচি ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের চরিত্রের মুখে কি নিজের কথা বসিয়েছেন না কি তাদের যে চিন্তাচেতনার বা অভিজ্ঞতার অনুভূতি উপন্যাসে পাই তা একান্তভাবে তাদেরই নিজস্ব ভাবনা ? লেখকের বিভিন্ন আত্মকথামূলক রচনা ৩ থেকে জানা যায় যে সদ্ গোপ-চাষী এবং বাউড়ী-বাগদী ইত্যাদি বর্ণের মানুষের সঙ্গে লেখকের নিবিড় পরিচয় ছিল। সেই পরিচিতির সুবাদে কল্পনার মিশেলে তিনি চরিত্রগুলিকে দিয়ে যদি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনবোধসঞ্জাত কিছু কথা বলিয়ে নিতেন বা কিছু কাজ করিয়ে নিতেন তাতেও ইতিহাস অনুসন্ধানের উপাদান কিছু কম পড়ত না।লেখকের জীবনদর্শনে তিনি যে শ্রেণীটির প্রতিভূ সেই শ্রেণীটির মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলে তাও গবেষকের রীতিমত কাজে লাগে। আসলে লিখিত যে কোনও উপাদান থেকে বাস্তব ইতিহাস খুঁজতে গেলে সেই উপাদানের মাধ্যমটির ‘আপেক্ষিক ঘনত্ব’ নির্ণয় করে নেওয়াটা জরুরী ।রচনাটি বাস্তবকে প্রতিফলিত করার বদলে প্রতিসৃত করে থাকলে , সেই প্রতিসরণের মাত্রা নিরূপণ এবং ভিন্ন ভিন্ন ‘মাধ্যমে’র আপেক্ষিক ঘনত্ব ও প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করাই গবেষকের কাজ। সাহিত্যিক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ‘ভাব’-কে ‘রসে’ পরিণত ক’রে তাকে ‘সামান্য’ ও সর্বজনীন করে তোলেন ৫। সেখানে বাস্তব থেকে প্রতিসরণ ঘটেছে কি না তা বোঝার উপায় হ’ল সেই যুগের রক্ত-মাংসের মানুষের রোজনামচা,আত্মকথা,জীবনী ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রকাশমাধ্যমের সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবকে মিলিয়ে দেখা। এই সমকালিক (synchronic) তুলনার মাধ্যমে ইতিহাসের গবেষকের পক্ষে যুগ-সংস্কৃতির রসনির্যাসটুকু ছাড়াও রক্তমাংসের মানুষের ভাবজগতের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক হিতেশরঞ্জন সান্যালের ‘স্বরাজের পথে’ বইটিতে পাওয়া সে যুগের কিছু মানুষের সাক্ষাৎকারের বিবরণ ৬ , বিশ শতকের প্রথমার্ধের কিছু প্রচার পুস্তিকা ৭ ,একটি জীবনীগ্রন্থ ৮ –এককথায় বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের মানুষের মানসিকতার পরিচয় বহন করছে এমন কিছু লিখিত উপাদানকে নজরে আনলে দেখা যায় যে ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে চরিত্রগুলির যে ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে ,তা কিন্তু কোনোমতেই একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু ,পড়তি-জমিদারবংশের উত্তরাধিকারী, কংগ্রেসী ‘ভদ্রলোকে’র গোষ্ঠীগত-আদর্শোভূত অলীক আদর্শবাদী কল্পনামাত্র নয়। বীরভূমের গণ্ডীর বাইরে, উপন্যাসে বিধৃত সময়-কালের আসেপাশে বহু ঘটনা ও মানুষের সঙ্গে উপন্যাসের বহু ঘটনা ও চরিত্রের চিন্তা-চেতনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯৬৭ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ‘গণদেবতা’র দু’টি পর্বই ১৯৪২ থেকে ’৪৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে(১৩৯১ বঙ্গাব্দে) শেষপর্ব ‘দ্বারমণ্ডল’ লেখকের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।‘ গণদেবতা’ও ‘পঞ্চগ্রাম’ –এই দুই পর্বে ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধের আলোচনা মূলত ‘গণদেবতা - পঞ্চগ্রাম’ পর্ব –দু’টিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, যদিও মনোজগতের বিবর্তনের ছবিটি ‘দ্বারমণ্ডল’ পর্বেও অতীব সুস্পষ্ঠ, তবে সেটি অন্য খাতে প্রবাহিত বলে এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আলোচনার সূচনায় উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার দাখিল করলে বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করাটা সহজ হবে।

সদ্ গোপ ঘরের ছেলে দেবনাথ ঘোষ, স্থানীয় ইউনিয়নবোর্ডের অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত, এই উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র ও নায়ক। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে অবস্থাপন্ন জোতদার শ্রীহরি ঘোষ কীভাবে ধীরে-ধীরে গ্রামের অর্থনীতির ওপর তার দখলদারী কায়েম করছে। এই দখলদারীর প্রক্রিয়ায় দেবু’র সঙ্গে সরাসরি পারস্পরিক স্বার্থসঞ্জাত না হলেও জনস্বার্থ-সম্পর্কিত নৈতিক ও তাত্তিক বিরোধের কারণ তৈরি হয়। পঞ্চগ্রামের সমাজে সামাজিক মর্যাদা ও শুচিতা সম্পর্কিত ‘অধিকারভেদে’র পর্যায়ক্রম ছিল কিন্তু তাদের আর্দশ ও বিশ্বাসের জগৎটি ছিল অভিন্ন। ঔপনিবেষিক শাসনের নানান যন্ত্র এবং বাজার সেই ধর্মাচরণের ‘আধিকারভেদে’র ক্রমোচ্চতার জগতে ধীরে-ধীরে শ্রেণীগত বিভাজন নিয়ে এল এবং সেই প্রক্রিয়ায় ‘সেকাল’ ও ‘একালে’র বিশ্বাস ও ন্যায়নীতির মধ্যে কখনও মেরূকরণ, কখনও ভাব-সংঘাত ঘটাতে লাগল। উপন্যাসে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন এবং কৃষকে পর্যবসিত একদা জমিদারবংশোদ্ভূত দ্বারকা চৌধুরী সেকালের বিশ্বাস নিয়ে মেরুর একপ্রান্তে অধিষ্টিত, অপরপ্রান্তে রয়েছে ন্যায়রত্নেরই পৌত্র তত্ত্বগতভাবে বিপ্রতীপ মূল্যবোধে বিশ্বাসী মেধাবী যুবক কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী বিশ্বনাথ। সেকাল ও একালের মধ্যে ভাবসংঘাত পর্বের চিন্তানায়কের ভূমিকায় রয়েছে দেবনাথ। সে এই উপন্যাসের ঘটনাক্রমের দর্শকের চরিত্রে, অধিকাংশ সময়েই অন্য চরিত্রগুলিকে পাঠক তার চোখ দিয়েই প্রত্যক্ষ করেন। দেবুর ভাবজগতের ক্রমিক রূপান্তরই উপন্যাসের মুক্ষ্য উপজীব্য। পরম্পরাগত সমাজবিধি মেনে এবং বিধিনির্দিষ্ট দুঃখ সহ্য ক’রে দীনতার মধ্যেও হীনতা ৯ বর্জন করে আত্মসংযমকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ভেবে পথ চলতে-চলতে জীবনকে নানাভাবে দেখে দেবু ক্রমশ জীবনের দাবির বৈধতাকে স্বীকৃতি দিতে শিখল।

একজন সেটেল্ মেন্ট অফিসারের (কানুনগো) অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে দেবুকে জেলে যেতে হয়। এই ঘটনা তাকে গ্রামের লোকের কাছে সাহসী বীর হিসাবে পরিচিতি দেয়। জেল থেকে ফিরে গ্রামের রাজনৈতিক নজরবন্দী যতীনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর দেবুর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার ঘটে। দেবুর প্রতি গ্রামের মানুষের বিশ্বাস কৃষক-অসন্তোষের সময়ে দেবুর মধ্যে তাদের পথপ্রদর্শক নেতাকে খুঁজে নিতে চায়। জোতদার শ্রীহরি গোটা গ্রামকে নিজের ক্ষমতা এবং দাক্ষিণ্যের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এইরকম পরিস্থিতিতে কলেরার প্রাদুর্ভাবে রোগাক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দেবুকে চরম মূল্য দিতে হয় –স্ত্রীপুত্রের জীবন দিয়ে; তারই মাধ্যমে স্ত্রীপুত্রের দেহে রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছিল। খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে উত্তেজিত করার আভিযোগে পুলিশ যতীনকে সদর শহরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। সমবেত গ্রামবাসীর কাছ থেকে যতীনের বিদায়ের সঙ্গেই ‘গণদেবতা’র প্রথম পর্বের সমাপ্তি। ‘পঞ্চগ্রাম’ পর্বের শুরু জমিদারের বিরূদ্ধে খাজনাবৃদ্ধির প্রতিবাদী আন্দোলন দিয়ে। এলাকার প্রধান জমিদার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তৈরি করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যৌথ আন্দোলনকে থামিয়ে দেন। এই সময়েই বন্যাবিদ্ধস্ত গ্রামে দেবু বিশ্বনাথের সহায়তায় ত্রাণকার্যের দায়িত্ব নেয়। অন্যদিকে শ্রীহরিও এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গোটা গ্রামকে হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করে। পঞ্চায়েত ডাকিয়ে দেবুকে শ্রীহরি ‘পদ্মকামারণী’ ও দুর্গা‘মুচিনী’র সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অজুহাতে পতিত ঘোষণা করে । সংসার সম্পর্কে বীতস্পৃহ দেবু তীর্থযাত্রায় বার হয় এবং এই তীর্থভ্রমণ তার মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার ও প্রসার ঘটায়। গ্রামে ফিরে আইন-অমান্য আন্দোলনে স্থানীয় জনগণের নেতৃত্ব দিয়ে সে কারাবরণ করে। কারামুক্তির পর ফিরে এসে দেখে অর্থনৈতিক দিক থেকে গোটা গ্রামই শ্রীহরির করায়ত্ত হয়ে গেছে ।দেবুর চিন্তা-চেতনা’র জগতে কিন্তু বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। জেল থেকে ফেরার পথে স্বামীপরিত্যক্তা পদ্মকামারণী গ্রাম ছেড়ে গিয়ে এক খ্রিস্টান চাকুরীজীবীকে বিবাহ ক’রে সন্তানবতী হয়েছে দেখে সংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার বদলে দেবু আনন্দিত হয়ে ওঠে। সে বিধবা স্বর্ণময়ীকে বিবাহ ক’রে তাকে সহধর্মিণীর অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে ‘ধর্মের সংসার’১০ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেয়।

তারাশঙ্কর বীরভূমের মস্তালি গ্রামের মহাজন ১১ শ্রীকৃষ্ণ পালের আদলে উপন্যাসের শ্রীহরি চরিত্রটিকে রচনা করেছেন।‘ছিরু’ বা ‘ছিরে পাল’ থেকে শ্রীহরি ঘোষ হ’য়ে যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চয় করলেও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে কঙ্কনার জমিদার মুখুজ্যেবাবুদের অথবা অন্য ভদ্র গৃহস্তদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত নয় । কেবল সম্পদ সঞ্চয় ও জমির মালিকানা নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয় , গ্রামের সম্ভ্রম ; সে দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আদায় করতে চায়। একসময়ে তার আদর্শ ছিল দুর্গাপুরের বিশিষ্ট জোতদার ও পত্তনিদার ত্রিপুরা সিং।তার অত্যাচারের কাহিনি একসময়ে শ্রীহরিকে ক্ষমতা প্রতিষ্টার অনুপ্রেরণা যোগাত। কিন্তু ‘সেকাল’ যে ক্রমশ অন্তর্হিত হয়েছে ,সম্ভ্রম আদায়ের জন্যে এখন আচার-আচরণে ভদ্রতার আবরণ থাকা দরকার সেকথা সে অনুভব করে। নতুন একধরনের ব্যক্তিত্বের ধারণা গ্রাম্যসমাজের জোতদার শ্রেণীর মধ্যে এই সময়ে গড়ে উঠেছিল। তারাশঙ্কর উপন্যাসে শ্রীহরি চরিত্রের মানসিক বিবর্তন দেখিয়েছেন। পুরোনো নিন্দনীয় অভ্যাস ত্যাগ ক’রে , গ্রামের মানুষের ধর্মাচরণে নানাবিধ সহায়তা ও দানধ্যানের মাধ্যমে শ্রীহরি গ্রামের লোকের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করে নেতৃত্বের দাবিদার হতে চায়। কিন্তু গ্রামের লোক তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়েও যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অথবা সম্মানপ্রদর্শন করে না ১২। কিন্তু পরিবর্তিত অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে সে নতুন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে গ্রামকে করায়ত্ত করার প্রক্রিয়ায় সফল। অথচ ‘সেকালের’ মহৎ আর্দশের প্রতি তার তেমন আগ্রহ না থাকলেও পরম্পরাগত কর্মফলের ধারণার বশীভূত হ’য়ে সে পরজন্মে ‘রাজার’১৩ সম্মান পাওয়ার আশায় এজন্মের অকৃজ্ঞতা সহ্য করেও পুণ্যকর্ম করে চলতে চায়! ঐতিহাসিক হিতেশরঞ্জন সান্যাল দেখিয়েছেন , বাংলার গ্রামাঞ্চলে ,বিশেষত পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলিতে জোতদার মহাজনরা কীভাবে জমিদার বা পত্তনিদারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কোথাও-কোথাও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁরাই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সাধারণ কৃষককে সঙ্গে নিয়ে। গ্রামীণ সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করলে যেমন ব্যাপক প্রতিরোধের মাধ্যমে জমিদারকে বশে আনা যায় , তেমন-ই সাধারণ কৃষকদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেও ক্ষমতার ক্ষেত্র প্রসারিত ক’রে তোলা সম্ভব হয়। উপন্যাসে শ্রীহরির চরিত্রে এই সম্ভাবনার বীজ লেখক বপন করেছেন । জোতদার শ্রীহরি শিবকালীপুরের পত্তনিতালুক নিজে কিনে নিয়ে পুরোনো জমিদারের সঙ্গে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করে। দেবতা,ধর্ম এবং সমাজের উদ্ধারের দায়িত্ব।১৪ সে স্বঘোষিত অভিভাবকের তৎপরতায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

অতিজটিল এক মানসিক বিবর্তন দেবনাথের ব্যক্তিত্বে লক্ষ্য করা যায়। তার কিছুটা শিক্ষা আছে ,চাষের কঠোর কায়িক শ্রম থেকে সে মুক্ত ,অথচ জমি ভাগে ,ঠিকার বন্দোবস্ত ক’রে দেওয়ার জন্য কৃষিসম্পর্কিত সমস্যাগুলির সঙ্গে সে পুরোমাত্রায় পরিচিত,সুসম্বদ্ধ চিন্তার ক্ষমতা তার আছে। শিবকালীপুর গ্রামটি প্রধানত শূদ্রের গ্রাম। হরেন ঘোষাল(একমাত্র ম্যাট্রিক পাশ ব্রাহ্মণ),জগন ঘোষ (জাতিতে কায়স্থ ,গ্রামের হাতুড়ে চিকিৎসক)এবং দেবনাথ (জাতিতে সদ্ গোপ কিন্তু পেশায় পণ্ডিত) গ্রামসমাজের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রত্যাশিত নেতা। এদের মধ্যে দেবনাথ যোগ্যতায় সকলের চেয়ে এগিয়ে ,সে নিজেও এ ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী । একধরনের অহংকারও উপন্যাসের শুরুতে তার মনে দেখা গিয়েছে ১৫। মেধাবী ছাত্র হিসাবে একদিন ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার ঊচ্চাকাঙ্ক্ষা তার মনে ছিল,কিন্তু বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে সে অত্যন্ত মনোবেদনা নিয়ে নিতান্ত কর্তব্যের তাগিদে চাষের কাজে মন দেয়। গ্রাম্য পাঠশালার পন্ডিত নিযুক্ত হওয়ার পর গ্রামের লোকের কাছে কিছুটা সম্মান পেলেও তাতে তার মন ভরেনি। গ্রামকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। গ্রাম্য সমাজ-শৃঙ্খলা , সমাজবিধি, পরম্পরাগত ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বন্ধু বিশ্বনাথের কাছ থেকে বইপত্র নিয়ে প’ড়ে এবং তার কথা শুনে দেবু অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে ,তবু ন্যায়রত্ন বা দ্বারকা চৌধুরীর সেকেলে নীতিবোধই তার কাছে অধিকতর স্বস্তিদায়ক। তারাশঙ্করের নিজের লেখা থেকে জানা যায় যে ,মার্ক্সবাদী ভাবধারা তাঁর মনকে যথেষ্ট নাড়া দিলেও তিনি এই বৈজ্ঞানিক জীবনমুখী আদর্শে ঠিক স্বস্তি পাননি। পাশ্চাত্য উপস্থাপনায় ভারতীয় সভ্যতার অপরিবর্তনীয়তার যে তত্ত্বটি খাড়া করা হয় সেটিকে তিনি মানতেন না। ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ চলমান ও পরিবর্তনশীল –কিন্তু ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ সনাতন১৬। দেবুর চরিত্রে এই সনাতন ভারতবর্ষের জীবনচর্যার সন্ধান এবং চলমান ভারতের উপযোগী কর্মসাধনা –দু’টি দিকই লেখক টানা এবং প’ড়েনের সুতোতে বুনেছেন।

মুচি উপেনের শব বহন করার ফলেই কলেরার জীবাণু দেবুরই মাধ্যমে তার স্ত্রী-পুত্রের শরীরে সংক্রামিত হয়েছিল। মুচি ব’লে তার সৎকারের দায়িত্ব নিতে দেবুর সংস্কারে কোথাও বাধেনি। পাতু মুচিকে কলেরার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে কলেরার সঙ্গে দেবরোষের কার্যকারণ সম্পর্ক নেই; একথা দেবু বোঝাতে পেরেছিল১৭। সে দেবধর্মে বিশ্বাসী হলেও এক্ষেত্রে সে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী অবস্থান নিতে পেরেছে। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়ে তার অনুতাপদগ্ধ হৃদয় সান্ত্বনা পেল ; যখন ন্যায়রত্ন ভাগবত থেকে একটি গল্প শুনিয়ে আদর্শের প্রতি সত্যনিষ্ঠ এক অমিতপুরুষকারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের উপমা দেবুর সম্পর্কে প্রয়োগ করলেন। ব্রাহ্মণ সর্বস্ব হারিয়ে ,প্রিয়জন-বিয়োগ মেনে নিয়েও মেছুনীর অপবিত্রডালা থেকে শালগ্রাম উদ্ধার করে সে’টিকে নিজের কাছে রক্ষা করেন। ন্যায়রত্ন বলেন যে, ‘আত্মা নারায়ণ কিন্তু ঐ বায়েন-বাউড়ীদের পতিত অবস্থাকে মেছুনীর ডালার সঙ্গে তুলনা করি’১৮। ন্যায়রত্ন‘আধুনিক যুবক’ যতীন ও দেবুকে উদ্দেশ্য ক’রে ;তারা যেন বায়েন বাউড়ীদের সঙ্গে মেছুনীর অপবিত্রডালার তুলনায় ক্ষুব্ধ না হয়,সেইজন্য প্রকারান্তরে ক্ষমা চেয়ে রেখেছিলেন। দেবু কিন্তু এই গল্পটিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে ও সান্ত্বনা পায়। গণদেবতাকে উদ্ধার করার ব্রতে অবিচল দেবুর মনের গহনে চিরকালীন সংস্কার অনুযায়ী ব্রাহ্মণত্বের সত্ত্বগুণকে নিজের মধ্যে অনুভব করার তীব্র আকুতি হয়ত লুকিয়েছিল, তাই এই গল্পটি শুনে তার হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে এবং চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এরই পাশাপাশি লেখক দেখিয়েছেন যে , স্ত্রীপুত্রকে হারিয়ে তার মনে যখন একধরনের বৈরাগ্য দেখা দেয় তার সঙ্গে কিন্তু ‘প্রাক্তন’ অথবা ‘অদৃষ্টে’র অমোঘতায় বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক ছিল না ১৯ । যতীনের সঙ্গে পরিচিতি ও বিশ্বনাথের সঙ্গে তর্কবিতর্ক তার মনের দিগন্তকে প্রসারিত করে, চেতনায় আনে পরিবর্তন। স্ত্রীর অবর্তমানে অনিরুদ্ধ কামারের পরিত্যক্তা স্ত্রী পদ্ম’র তাকে কিছু দায়িত্ব নিতে হয়, মুচি পরিবারের মেয়ে স্বৈরিণী দুর্গাও এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে। পদ্ম ও দুর্গার জীবনকে বোঝার এই সুযোগও তার অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মোচিত করে। মিথ্যা অপবাদে শ্রীহরির বশীভূত পঞ্চায়েত দেবুকে পতিত করতে চাইলে দেবু অস্পৃশ্য দুর্গার হাতে জল খেতে চেয়ে সমাজের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে ২০। অথচ একসময়ে কঙ্কনার একজন জমিদারের জলপান-সম্পর্কিত কঠোর হিন্দুয়ানী আচারপালনকে সে বিশেষ সমীহ করত ২১ । তীর্থদর্শন তাকে দেশ এবং দেশের মানুষকে গভীরতর বোধ থেকে চিনতে শেখায় এবং চলমান ভারতবর্ষের নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন তার মনে জাগিয়ে তোলে। দেবুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে ব্যগ্র পদ্মকে একদিন সে সংযমের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। দেবু তার শিক্ষা-সংস্কার অনুযায়ী পদ্মকে প্রত্যাখ্যান করাই উচিত কাজ বলে মনে করল। প্রত্যাখ্যাত পদ্ম দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রথমে শ্রীহরির কাছে আশ্রয় নেয়, পরে বোধবুদ্ধি ফিরে আসতেই কাউকে কিছু না জানিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে। পদ্মের এই পরিণতির জন্য দুঃখ বোধ করলেও তার প্রকৃতি-তাড়িত প্রণোদনা ছিল দেবুর কাছে নিন্দনীয় অপরাধ২২। পরবর্তীকালে কিন্তু পদ্ম’র জৈবিক কামনার বৈধতাকে দেবু স্বীকৃতি দিতে পেরেছিল। পদ্ম যখন তার খ্রিস্টান স্বামী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে দেবুর সামনে উপস্থিত হয় তখন জীবনের এই জয় প্রত্যক্ষ করে তার মন আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। এই ঔদার্য তার মনের পুরোনো সংস্কার কাটিয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে। চাষী তিনকড়ির মেধাবিনী বিধবা মেয়ে স্বর্ণময়ী’র লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছিল দেবু ;সমাজের অনুশাসন ও শ্রীহরির চোখরাঙানোকে উপেক্ষা করে। এই স্বর্ণময়ীকেই সে সহধর্মিনী হিসাবে প্রেম নিবেদন করে। সমাজনির্দিষ্ট স্বঘরের কন্যাকে বিবাহ করার কারণ ;হয়ত তার অবচেতন মনের সংস্কার।

দেবুর চরিত্রে সেকাল ও একালের মধ্যে এই নিরন্তর টানাপ’ড়েন এবং ক্রমশ সেকালের শৃঙ্খল ভেঙে নতুন যুগের আমন্ত্রণে সাড়া দেবার প্রবণতা অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। একদিন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটিকে সে টিঁকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয়েছিল। ‘যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী’২৩ অর্থাৎ যতদিন চন্দ্রসূর্যপৃথিবী থাকবে, ততদিনই চণ্ডীমণ্ডপটির অস্তিত্ব থাকবে এই বিশ্বাসে দেবু শিহরিত হ’ত। কারাবাসের সময়ে কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ;তাকে অন্য মানুষে পরিণত করেছে। সে জেনেছে এদেশের মানুষ কখনও মরবে না, মহামঙ্গলময়মূর্তিতে নবজীবন লাভ করবে। সে থাকবে ‘যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ’ ২৪। গণদেবতাকে দেবু প্রত্যক্ষ করল মানুষের মধ্যে ,যাদের সহনশক্তি বিস্ময়কর, নাভিশ্বাস ফেলেও আবার নবজীবনে জাগ্রত হয় যে মানুষ। যুগ-যুগান্তরের ,অতীতকালের মানুষের এই ইতিহাসের সঙ্গে তার ‘নতুন মনের’ কল্প-কামনার অদ্ভুত মিল সে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করল। ভেঙে পড়া চণ্ডীমণ্ডপকে সারিয়ে তোলার বদলে বিশ্বনাথ সেখানে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে বলায় আহত দেবু বিশ্বনাথকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিল ২৫। তখন অবধি সে প্রাণপনে সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে ছিল। সেই সংস্কার কাটিয়ে উঠে গণদেবতাকে হৃদয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ঠাঁই দেবার আত্মপ্রত্যয়ী মানসিক রূপান্তরই কাহিনির উপজীব্য।

উপন্যাসের নায়িকা দুর্গা মুচি পরিবারের অচ্ছুত কন্যা । সে স্বৈরিণী,সুন্দরী,বুদ্ধিমতী। উপন্যাসে তার হৃদয়বত্তার বহুবিধ পরিচয় পাওয়া গেছে। শ্রীহরি ও থানার জমাদার যে দেবু-অনিরুদ্ধ-যতীন-জগন ডাক্তারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তার আগাম খবর দুর্গা তাদের জানিয়ে দিয়ে—পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্পদষ্ট হওয়ার নিখুঁত অভিনয় করে। উপন্যাসের শুরুর দিকে উচ্চবর্ণের ও বর্গের ‘বাবু’দের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও মেলামেশার কথা সে সগর্বে প্রচার করে। সমাজের প্রতিপত্তি সম্পন্ন উচ্চবর্ণের(কঙ্কনার ‘বাবু’রা) ভদ্রলোকেরা বাগদী বাড়ির বউ-ঝিদের অর্থের বিনিময়ে ভোগ করতেন । সদ্ গোপ নবশাখ সমাজের রমণীকে এত সহজে ভোগ করার সুযোগ ছিল না কিন্তু দরিদ্র বাগদীদের নীতিবোধ তথাকথিত উচ্চবর্ণের ধারণার থেকে সম্পূর্ণ অন্য ছিল। দুর্গার ঊর্ধ্বগামী মানসিকতা তাকে উচ্চবর্ণের অনুরূপ; নীতিবোধ অবচেতনের তাগিদেই নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। উনিশ শতকের শেষপর্ব থেকে সামাজিক ঊর্ধ্বগামিতার পরিচয় হিসাবে শুদ্ধতার নানান রীতি হিন্দুত্ববাদী ধারণার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণের মধ্যে চুঁইয়ে আসে। এই ঊর্ধ্বগামী মানসিকতারই প্রভাব হয়ত দুর্গার ওপর পড়েছিল। তার গৌরবর্ণ সম্ভবত প্রমাণ করে যে সে উচ্চবর্ণসম্ভূত ২৬, অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্নতার ‘বাতিক’ও ২৭ এই ঊর্ধ্বগামী মানসিক প্রবণতারই একটি ব্যঞ্জনা। দেবনাথকে সে গভীরভাবে ভালবাসে কিন্তু তাকে সামান্য সেবাযত্ন করার অধিকারও তার নেই কেননা সে নীচবংশজাত এবং দেবনাথ সমাজবিধি মেনে চলতেই অভ্যস্ত বলে দুর্গার ভালবাসায় সাড়া দেবার কথা তার দূরতম কল্পনাতেও কখন ঠাঁই পায়নি। ভালবাসার প্রকাশকে সে প্রগলভতা বলেই ধরে নিয়েছে। দুর্গা মুচিবায়েনের ঘরে জন্মগ্রহণকে সম্ভবত তার পূর্বজন্মকৃত প্রারব্ধ কর্মেরই ফল বলে –অবচেতনে ভেবে নেয়। তাই, উপন্যাসের শেষে আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে শুচিতা অর্জন করতে চায়। ‘গণদেবতা’র প্রথম পর্বের প্রগলভা দুর্গা বিলাসিনী পঞ্চগ্রামের শেষপর্বে শুভ্রবসনা ,নিরাভরণা,বিশীর্ণদেহা,দান-ধ্যান ও রোগাক্রান্তের সেবায় নিযুক্ত এক রমণী২৮। দেবু তার ভাবী স্ত্রী স্বর্ণকে স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সংসার জীবনের গল্প দুর্গার উপস্থিতিতেই শোনাতে থাকে। শুনতে-শুনতে সব কথা না বুঝলেও আবেগে দুর্গার বুক ভরে উঠছিল ২৯। দেবনাথ বা স্বর্ণের আলোকপ্রাপ্ত মনও দুর্গার মুচিনী পরিচয়টাকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছিল যে, দেবুর প্রেমিকা হিসাবে পরিগণিত হবার অসম্ভাব্যতা নিয়ে তাদের মনে কোনও সংসয় ছিল না। তার উপস্থিতিতে প্রেমবিনিময় করতে উভয়ের কেউ-ই সঙ্কোচবোধ করেনি। এই ঘটনার বহু আগে মানসিক বিভ্রমের ফলে দেবু একদিন দুর্গাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেছিল ৩০। নানান কারণে দুর্গারই ঐকান্তিকতায় দেবুর সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল নিবিড়। তবু, দেবু’র প্রতি দুর্গার প্রেম কোনোদিনই প্রতিদান পায়নি। দেবু’র শিক্ষা-সংস্কার তাকে এই প্রেমের প্রতিদান দেওয়ার কথা কল্পনাতেও আনতে দেয়নি। দুর্গাকে দেবু যখন সাম্যের বাণী শোনায় যে একদিন নরক-অচ্ছুত-মন্দ থাকবে না—সকলের জন্যই স্বর্গ উন্মুক্ত হবে, তখন এই সাম্যের আশা দুর্গাকে পরজন্মে দেবনাথকে নিজের করে পাবার আশা ও ভরসা যোগায়। প্রকৃতি-তাড়িত কামনার নেশায় নয়,তপস্বিনী উমার সাধনা নিয়ে উপন্যাসের দুর্গা দেবনাথকে পরজন্মে পেতে চায়। ধর্মবিহিত পুনর্জন্মনাশ ও মুমুক্ষা তার ভাবনায় ছিল না। দেবুর ভবিষ্যৎ স্বর্গকল্পনায় অচ্ছুত বলে কেউ থাকবে না এই কথায় সে ‘দ্বিজ’ত্বের (দ্বিতীয়বার জন্মের) আকাঙ্ক্ষায় ,বিশ্বাসে বুক বাঁধে। ‘তাই হয়? …তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম। করছি এই জন্যে –তোমাকে পাবার জন্যে’ ৩১।

বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাংলার গ্রাম-জনপদে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্য থেকে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল । উচ্চবর্ণের এবং উচ্চবর্গের দীর্ঘকালাবধি অবজ্ঞা এই শ্রেণীর মানুষকে প্রতিবাদী ক’রে তুলে সমাজসংস্কারে অনুপ্রেরণা যোগায়। একজন কানুনগো—‘ভদ্রলোক’-শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী—দেবুকে ‘তুই’ সম্ভাষণ করে জল খেতে চাইলে অপমানিত বোধ করেও দেবু তৃষ্ণার্তকে জল,কদমা এবং মুখশুদ্ধি দিতে কার্পণ্য করেনি। তার পরেও কানুনগো অনাবশ্যকভাবে তাকে ‘এই ছোকরা’ বলে ডেকে ওঠায় দেবু—‘কিরে, কি বলছিস?’বলে প্রত্যুত্তর দেয়। বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ কানুনগো এরই শোধ তোলে জমির পরিমাপ সংক্রান্ত বচসাকে কেন্দ্র করে আইনভঙ্গের অজুহাতে দেবুকে জেলে পাঠিয়ে।

ভদ্রলোকশ্রেণীর এ জাতীয় ‘অভদ্রজনোচিত’ আচরণের প্রতিবাদ দেবু কিশোর বয়স থেকেই করে এসেছে ৩২। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ভীমচন্দ্র মাহাতোর প্রথম জীবনের ঘটনার অদ্ভুত সাদৃশ্য! ১৯৩৯ সালে তাঁর সঙ্গে স্থানীয় থানার দারোগাবাবু দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং ভীমচন্দ্র দারোগাকে তার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন,এমনকি গায়েও একঘা বসিয়ে দেন। এই ঘটনার সময় পর্যন্ত ভীমচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যদিও পরে তিনি কংগ্রেসকর্মী হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন৩৩। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার এই প্রয়াস ছিল সার্বিক চেতনারই অঙ্গ। ঐতিহ্যগত সংস্কারে যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের প্রতি কিন্তু এই সংস্কারকামী গোষ্ঠীর অনেকেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেবু স্বয়ং তার চেয়ে বয়সে পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট বিশ্বনাথ তাকে দাদা সম্বোধন করলে কুন্ঠা প্রকাশ করে, এমনকি ‘সামাজিক পার্থক্য’কে (বর্ণের এবং বর্গের) যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সে বলেছিল—‘আমার ওতে অপরাধ হয়’ ৩৪। সমাজনিন্দিত আচরণ প্রসঙ্গে যুক্তির কথা না তুলে দেবু বিশ্বনাথকে বলেছিল যে বংশের ‘পুণ্যফল’ই বিশ্বনাথকে রক্ষা করলেও দেবু অনুরূপ আচরণ করলে তার ফল হবে মারাত্মক—‘আমি ফেটে মরে যাব’! অনুরূপ মনোভাব দেখা গেছে বিশশতকের কয়েকজন তথাকথিত নিম্নবর্ণের সমাজকর্মীর মধ্যে। মেদিনীপুরে পৌণ্ডক্ষত্রিয় জাতিসমাজের নেতৃস্থানীয় মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ‘বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ’(১৯২৩) নামে নিম্নবর্ণের একটি সম্মিলিত সংগঠনের প্রতিষ্টা করেন। এই সঙ্ঘের প্রচার-পুস্তিকায়৩৫ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর উল্লেখ করে সকল জাতিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব দান করবার দাবি তুলেছেন। ব্রাহ্মনত্বের এই গৌরব প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েও মণীন্দ্রনাথ প্রত্যেক বর্ণের মানুষের ‘নিজস্ব পরিচয়ে’র দাবির স্বীকৃতি চেয়ে আন্দোলন করেছেন। প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয়ের নায্য প্রাপ্যের দাবির পাশাপাশি ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের চেষ্টার মধ্যে সেকাল ও একালের দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থান—দুই-ই অনুভব করা যায়। ‘বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ’ নামে একটি ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থে(১৯২৬) মণীন্দ্রনাথ; দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রশস্তি গেয়েছেন। দিগিন্দ্রনারায়ণের ব্রহ্মচর্য, বিলাসব্যসনে অনাসক্তি ইত্যাদি গুণের কথা বলে মণীন্দ্রনাথ (পরম্পরাগত সমাজবিধি অনুযায়ী যাঁর জল-অচল) দিগিন্দ্রনারায়ণের ‘ব্রাহ্মণ’ পরিচয়টিকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। দিগিন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরূদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন৩৬। মণীন্দ্রনাথ নিজেও একজন প্রতিবাদী সমাজ-সংস্কারক ,তবুও যুক্তির মাপকাঠির বদলে , ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও দিগিন্দ্রনারায়ণের জাতিভেদবিরোধী অবস্থান মণীন্দ্রনাথকে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল। জৈবিক প্রয়োজনের দাবি মেনেই দিগিন্দ্রনারায়ণ বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগতজীবনে তাঁর কঠোর ব্রহ্মচর্যপালন মণীন্দ্রনাথ প্রমুখ মানুষের চোখে তাঁকে বিশেষ সম্মানিত ক’রে তোলে। পরম্পরাগত সংস্কার ও যুক্তিবাদ এভাবেই নব্যহিন্দুত্ববাদী ধারণা এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে নানাভাবে মিলেমিশে গিয়েছিল। পৌত্রের বয়সী বিশ্বনাথ দ্বারকা চৌধুরী’র প্রণাম নিতে আপত্তি জানানোয় মর্মাহত দ্বারকা চৌধুরী’র মনোভাবের প্রতিধ্বনি করেই দেবু বিশ্বনাথের ‘ব্রাহ্মণত্বে’র ও বংশকৌলীন্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে’নিম্নবর্ণজাত’বয়োজ্যেষ্ঠের প্রণাম গ্রহণের অধিকারের বৈধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে ৩৭। অথচ উপন্যাসের অন্তিমপর্বে কিন্তু সেই দেবুই প্রাচীন সমাজবিধির ক্রমোচ্চতার ও অধিকাভেদের বৈষম্যের অবসান কামনা করেছে। একদিকে ঐতিহ্যগত সংস্কারকে ‘দেশীয়’ও জাতীয় (national) ভাবার বহুকাললালিত-বিশ্বাস, অপরদিকে যুক্তির উদ্ভাসে আলোকিত হয়ে ওঠার সহজাত প্রবণতা ছিল এযুগের আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীটির বৈশিষ্ট্য।

স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়ে শূন্য ঘর ছেড়ে তীর্থদর্শনে গিয়েও দেবু কাশীবাসী ন্যায়রত্নের উপদেশ মেনে দেশে ফিরে এসে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মন নিয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এলাহবাদে জওহরলালের পতাকা উত্তোলন দেখে তার নিজের গ্রামের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উপন্যাসের এই ঘটনাটি কিন্তু সেই যুগের আরও বহু মানুষেরই মানসিকতার প্রতিফলন। এটিকে লেখকের কষ্টকল্পনা ভাবলে ভুল হবে। পুরুলিয়া জেলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যৌবনে স্ত্রী-পুত্রবিয়োগের পর সংসার ত্যাগ করলে পুরুলিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা ঋষি নিবারণচন্দ্র তাঁকে বোঝান যে ,ব্যক্তিগত মুক্তির চেয়ে জাতির মুক্তিই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম না করে নিজের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করা কাপুরুষোচিত। নিবারণচন্দ্রের প্রভাবেই শ্রীশচন্দ্র দেশের কাজে ব্রতী হন এবং উপন্যাসের দেবু’র মতো আইন-অমান্য আন্দোলনে সামিল হন। প্রব্রজ্যা নেওয়ার ইচ্ছা থেকে নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতের জন্য জীবন উৎসর্গ করার সাহস তৈরি হয় ৩৮। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রায় সমগোত্রীয় অভিজ্ঞতা তাঁর ‘ভারতপথিক’ নামে অসমাপ্ত আত্মজীবনীটিতে ব্যক্ত করেছেন ৩৯।

উপন্যাসের শ্রীহরি ঘোষ,রহম শেখ ও ন্যায়রত্নের চরিত্রগুলি তারাশঙ্করের চোখে দেখা কিছু মানুষের আদলে রচিত। দেবনাথের চরিত্রটি কিন্তু লেখকের কল্পিত। ‘আমার সাহিত্যজীবন’ রচনায় তিনি বলেছেন যে, তাঁর চোখে ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্নময় ছবিটি অঙ্কিত ছিল, ‘পঞ্চগ্রাম’ উপন্যাসে দেবু’র মুখে আগামী সমাজের বর্ণনায় তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর নিজের জীবনে পিতা ও মাতা’র ভাবধারার মধ্যে যথাক্রমে সেকাল ওএকালকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৪০।উপন্যাসে দেবু’র চিন্তা-ভাবনায় ঐতিহ্য ও নবযুগের মধ্যে যে প্রবহমানতা দেখা গেছে তার সঙ্গে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত সেই কারণেই কোনো-কোনো গবেষকের বিচারে দেবু’র চরিত্রে বাস্তবতার অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে ! তাঁদের মতে ,দেবু’র মুখের ভাষায় উচ্চবর্গীয় ও তথাকথিত উদারমনোভাবাপন্ন চিন্তকদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। মার্ক্সীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী,নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা’র অন্যতম পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’ উপন্যাসটি বাঙালি জনমানসে তেমন গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছে বলে মানতে চাননি। তাঁর মতে, উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি অতি-সরলীকৃত নৈতিকতার জগৎ সাদা ও কালো এই দু’টিমাত্র বর্ণে রঞ্জিত। অনেকটা বাংলা যাত্রাপালার ঢং-এ পাপ ও পুণ্যের প্রতীক হিসেবেই উপন্যাসে চরিত্রগুলি সক্রিয়—শ্রীহরি,ন্যায়রত্ন ও দেবু যথাক্রমে দুর্নীতি,ন্যায় ও পরহিতব্রত ইত্যাদির প্রতীক। একমাত্র যে চরিত্রটির স্বাভাবিক বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, সেই দুর্গাকেও ‘বারবধূ-তবু-বুকে তার মধু’(a trat-with a golden heart) গোছের ছাঁচে ঢেলে—শেষপর্যন্ত সদাচারিণী পরহিতব্রতধারিণী চরিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে ৪১। প্রশ্ন হল : দুর্গার চরিত্রের রূপান্তর কি সত্যিই লেখকের আরোপিত কল্পনামাত্র? হিতেশরঞ্জন সান্যালের গবেষণা থেকে জানা যায় তমলুক মহকুমা’র নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় সত্যবতী নামে এক বারবণিতা আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আহত সত্যাগ্রহীদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। সত্যাগ্রহ চলাকালীন পুলিশের হাতে নানাভাবে নিগৃহীতা হয়েও তিনি কিন্তু নিরস্ত হননি। একই সময়ে কাঁথি থানা এলাকার পদ্মা দুধওয়ালি অনুরূপ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন ৪২। উপন্যাসে যে সময়কালটিতে দুর্গা’র মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সেটিও বাস্তবের সঙ্গে অভিন্ন। সত্যবতী ও পদ্মা তাঁদের সামাজিক ও পেশাগত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে স্বরাজ-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। যতীন ও বিশ্বনাথের সঙ্গে ভাববিনিময়ের সুযোগ ও দেবুকে পাওয়ার অবদমিত বাসনা থেকে দুর্গা’র মনে জন্মের গ্লানি ও পেশার কলঙ্ক থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা জাগাটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন সেযুগের আবহে নবযুগের প্রতিশ্রুতি বিকীর্ণ করে দিয়েছিল। আবার ,পরম্পরাগত বিশ্বাস অনুযায়ী ইহজন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মশোধনের আকাঙ্ক্ষাতেই দুর্গা কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মনিগ্রহের পথটি বেছে নিয়েছিল। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে তার পূজা দেওয়ার অধিকার ছিল না, নবযুগের প্রতিশ্রুতি তাকে ‘গণদেবতা’র অধিষ্টান যেখানে, নিজের দেহখানি তুলে ধ’রে ,সেই দেবালয়ের প্রদীপ হিসাবে প্রজ্বলিত হবার অনুপ্রেরণা দেয়। দেহোত্তীর্ণ হ’বার এই সাধনাকে পরিহাস করা মর্মান্তিক।

দেবনাথ স্বর্ণকে যে ভাষায় তাদের ভবিষ্যৎ ‘ধর্মের সংসারের’ বর্ণনা দিয়েছে তাতে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে সামাজিক কর্মপ্রেরণা ও দায়িত্ববোধকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে বলে রণজিৎ গুহ’র মনে হয়েছে। এই বর্ণনা যেন প্রেমিকার বদলে একদল দেশপ্রেমিকের সামনে দেওয়া বক্তৃতার সামিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বিচারে এই ‘ক্লান্তিকর উপদেশাত্মক’ আঙ্গিকটি আরোপিত ৪৩। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্য(১৮৯২ খ্রিঃ) নারীর সমানাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সহধর্মিণী হিসেবে নারীর নতুন রূপটিকে যে নির্মিতি ৪৪ দিয়েছিলেন তারই প্রভাবে বিশশতকের আলোকপ্রাপ্ত মানসিকতায় সহধর্মিণীর একটি আদর্শ ছবি ফুটে উঠেছিল। সদ্ গোপ চাষীর ঘরে জন্ম নিলেও দেবুর মধ্যে জ্ঞানদীপ্তির(enlightenment) যে প্রভাব পড়েছিল তাতে তার পক্ষে কর্মসঙ্গিনী-সহধর্মিণীর এই আদর্শে উদ্দীপিত হওয়া হয়তো অস্বাভাবিক ছিল না। সেই সঙ্গে পরম্পরাগত চেতনা তাকে নিষ্কাম কর্মসাধনার (altruism) দ্বারা প্রেমকে নিষ্কলুষ করে তোলার প্রেরণা জোগায়। বিধবা স্বর্ণকে পুনর্বিবাহ করে প্রথমা প্রিয়তমা পত্নীর শূন্যস্থানটিতে তাকে অধিষ্টিত করা ; এসবই বৈধতা পায় প্রকৃতি-তাড়িত-কামনার ঊর্ধ্বে সহধর্মিণীর সঙ্গে নিঃস্বার্থ কর্মসাধনায়। গান্ধী কথিত স্বরাজের সামাজিক নীতিবোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। সমষ্টির মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল হবে এবং সমষ্টির সংঘশক্তি থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি৪৫ বিকাশ লাভ করবে এই বোধ ছিল সার্বিক চেতনারই অঙ্গ।

শেষ করার আগে জগন্ময় মিত্রের গাওয়া জনপ্রিয় গানটির (১৯৪৭) কথা মনে করিয়ে দিতে চাই—*আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়,তুমি যে বহ্নিশিখা/মরণের ভালে এঁকে যাই মোরা জীবনের জয়টীকা/ মোদের প্রেমের দীপ্ত দীপক রাগে/ দিকে দিকে ওই সুপ্ত জনতা জাগে* ৪৬—নরনারীর প্রেমের নিভৃত অনুভূতিকেও মহিমময় করে তুলেছে জ্ঞানদীপ্ত মানবতার জাগরণের প্রতিশ্রুতি। আজকের চোখে উপদেশাত্মক বা ক্লান্তিকর ঠেকলেও জাতির আত্মপ্রতিষ্টার সাধনার বহুমুখী প্রবণতা সেযুগের অনুভূতির মাপকাঠিতেই বিচার্য,নইলে অবিচারের অবকাশ থেকে যায়,চিন্তা-চেতনার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজটিও সম্পূর্ণতা পায় না।

সূত্রনির্দেশ :

১। রজতকান্ত রায়,এক্সপ্লোরিং ইমোসনাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি,২০০১,পৃঃ ৭

২।ঐ,পৃঃ ১৪২

৩। বিচিত্রা(১৯৪৬),আমার কালের কথা(১৯৫১),কৈশোরস্মৃতি(১৯৫৬),আমার সাহিত্য জীবন, ২ খণ্ড(১৯৬৬)

৪।এ.কে.রামানুজন “টুওয়ার্ড অ্যান অ্যানথোলজি অব সিটিইমেজেস’’,রিচার্ড জি ফক্স(সম্পাঃ), “আর্বান ইন্ডিয়া : সোসাইটি,স্পেস অ্যান্ড ইমেজ” গ্রন্থে সংকলিত।

৫। রজতকান্ত রায়,এক্সপ্লোরিং ইমোসনাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি,২০০১,পৃঃ ৩২৪

৬।হিতেশরঞ্জন সান্যাল,স্বরাজের পথে ,প্যাপিরাস ,কলকাতা,১৯৯৩,গ্রন্থে সংকলিত লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার , ভীমচন্দ্র মাহাতোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার( ১৯৭৪),দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার( ১৯৭৪),অমূল্যরতন ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের( ১৯৭৭) পুনর্নির্মাণ

৭।শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ‘বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ’, বেঙ্গল পিপলস্ অ্যাসোসিয়েসন,খেজুরী,মেদিনীপুর, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

৮। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ‘বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ’,শ্রীসন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত,মেদিনীপুর, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,শ্রাবণ ১৩৮৭,পৃঃ১০৪

১০।ঐ,পৃঃ২৭৪

১১। রজতকান্ত রায়,ঐ,(১৯৮০ সালে পার্বতীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার থেকে সংকলিত),পৃঃ২২৬

১২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,শ্রাবণ ১৩৮৭,পৃঃ৫১

১৩।ঐ

১৪।ঐ,পৃঃ১২৫

১৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,ভাদ্র ১৩৮৪,পৃঃ৫২

১৬। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), তারাশঙ্করের জীবনী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ,কলকাতা ১৩৮৪(১৯৭৭),পৃঃ১১-১৫

১৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,ভাদ্র ১৩৮৪,পৃঃ২২০

১৮। ঐ,পৃঃ২৩১

১৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,শ্রাবণ ১৩৮৭,পৃঃ৫

২০। ঐ,পৃঃ১৪৫

২১। ঐ,পৃঃ২৬০

২২। ঐ,পৃঃ১৪৭

২৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,ভাদ্র ১৩৮৪,পৃঃ৩০

২৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,শ্রাবণ ১৩৮৭,পৃঃ২৬৭

২৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,ভাদ্র ১৩৮৪,পৃঃ৬৫

২৬। ঐ,পৃঃ৪০

২৭। ঐ,পৃঃ১৬১

২৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,শ্রাবণ ১৩৮৭,পৃঃ২৬৬

২৯। ঐ,পৃঃ২৭৪

৩০। ঐ,পৃঃ২৩১,২৩২

৩১। ঐ,পৃঃ২৭৫

৩২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,ভাদ্র ১৩৮৪,পৃঃ৮৫

৩৩। হিতেশরঞ্জন সান্যাল,স্বরাজের পথে ,প্যাপিরাস ,কলকাতা,১৯৯৩,গ্রন্থে সংকলিত লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার , ভীমচন্দ্র মাহাতোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার( ১৮ই জুলাই ১৯৭৪ সালে গৃহীত),পৃঃ২১

৩৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গণদেবতা,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,ভাদ্র ১৩৮৪,পৃঃ৬৪

৩৫। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ‘বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ’,বেঙ্গল পিপলস্ অ্যাসোসিয়েসন,খেজুরী,মেদিনীপুর, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ,পৃঃ৬

৩৬। শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ‘হিন্দুর নবজাগরণ’, প্রকাশক শ্রী দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী,আর্যসমাজ,কলিকাতা,পৃঃ১৩৩৮

৩৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম,মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, পেপার ব্যাক সং,শ্রাবণ ১৩৮৭,পৃঃ১৫

৩৮। হিতেশরঞ্জন সান্যাল,স্বরাজের পথে ,প্যাপিরাস ,কলকাতা,১৯৯৩,( শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ,১০ই আগস্ট ১৯৭৪),পৃঃ৩৪-৪৬

৩৯। সুভাষচন্দ্র বসু,সমগ্র রচনাবলী,প্রথম খণ্ড, ‘ভারতপথিক—একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী’,আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা ১৯৮০

৪০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘আমার কালের কথা’,বেঙ্গল পাবলিশার্স,কলকাতা ১৩৫৮(১৯৫১),পৃঃ ২১৭

৪১।রণজিৎ গুহ, ‘ফাইভ ভিলেজেস’,দি স্মল ভয়েস অফ হিস্ট্রি’, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক,২০০৯,পৃঃ ১৮৪-১৮৬

৪২। হিতেশরঞ্জন সান্যাল,স্বরাজের পথে ,প্যাপিরাস ,কলকাতা,১৯৯৩,( নন্দীগ্রাম থানার আমদাবাদ গ্রাম নিবাসী স্বাধীনতা –সংগ্রামী অমূল্যরতন ভৌমিকের সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকার ,৬ই মে ১৯৭৭),পৃঃ২৭

৪৩। রণজিৎ গুহ ,দি স্মল ভয়েস অফ হিস্ট্রি’, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক,২০০৯,পৃঃ ১৮৫

৪৪। রবীন্দ্ররচনাবলী,পঞ্চম খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ,পঃবঃ সরকার

৪৫। হিতেশরঞ্জন সান্যাল,স্বরাজের পথে ,প্যাপিরাস ,কলকাতা,১৯৯৩,পৃঃ৫২

৪৬। গায়ক শ্রী জগন্ময় মিত্র, কথা – শ্রী মোহিনী চৌধুরী,সুর-শ্রী কমল দাশগুপ্ত,১৯৪৭ সালে গানটি প্রথম রেকর্ড হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় ভাষা কোই

রমজান আলী

প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নব্য ভারতীয় আর্য স্তর থেকে বাংলা ভাষার মতো হিন্দি ভাষারও জন্ম হয়। উভয় ভাষা দাবি করে যে ‘চর্যাগীতি ‘তাদের আদি ভাষা নিদর্শন। বিশবিদ্যালয়ের সিলেবাস ধরে বাংলা ভাষা- ভাষী ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি হিন্দি ভাষা-ভাষী ছাত্রছাত্রীরাও চর্যাগীতিকে তাদের আদি ভাষা হিসাবেই পাঠ গ্রহণ করে। কেন করে? এ নিয়ে অকারণে হাতাহাতি করার দরকার নেই। হিন্দি ও বাংলার জন্মকালের দিক থেকে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আসলে এই দুই ভাষা একই পিতার ঔরসজাত। বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতির আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর হিন্দি সাহিত্যে চর্যাগীতির আবিষ্কারক রাহুল সাংকৃত্যায়ন। আবিষ্কৃত গ্রন্থও এক। তাই হিন্দি বাংলা ভাই ভাই।

পৃথিবীতে ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার ভিত্তিতে চিনের মান্দেরিন ভাষা প্রথম। তারপর স্প্যানিশ-ইংরাজি-হিন্দি-আরবি পরেই বাংলার স্থান। বাক-বিনিময়কারী ভাষা হিসাবে হিন্দির অবস্থান বাংলার আগে। অর্থাৎ সংখ্যাতত্বের দিক থেকে হিন্দি এগিয়ে। ভারতে সব থেকে বেশি মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলেন। হিন্দির সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। এসব নানা কারণে আমাদের অনেকেরই ধারণা হিন্দি ভারতের National Language. বা জাতীয় ভাষা।

কিন্তু ভারতের কোন জাতীয় ভাষা নেই। ভারতের সংবিধানে কোন জাতীয় ভাষার উল্লেখ নেই। পার্লামেণ্টের আলোচনায় ভাষা হিসাবে বলা হয়েছে –

“ Article 120 : Language to be used in Parliament – 1) Not withstanding anything in part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English : Provided that the chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.’’ 1

সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে দাপ্তরিক ভাষা ( Official Language ) হিসাবে হিন্দির উল্লেখ আছে –

১) The official language of the Union shall be Hindi in Devnagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all be official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement : Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devnagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে হিন্দির সঙ্গে অন্যানা ভাষাগুলি হল – বাংলা,ওড়িয়া,অসমীয়া,গুজরাটি,কান্নাড়া,কাশ্মীরী,পাঞ্জাবি,মারাঠি,তামিল,তেলেগু,মালায়লাম,উর্দু,সিন্ধি,কঙ্কনি,সংস্কৃত,মণিপুরি,নেপালি,বোরো,সাঁওতালি,মৈথিলি,ডোগরি,এবংভোজপুরি। ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দি ভাষার প্রাধান্য থাকলেও আজও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠী হিন্দিকে মেনে নেয় নি। তাই লোকসভায় দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরাজিকেও স্বীকৃ্তি দেওয়া হয়েছে । তাই হিন্দি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মতোই একটি ভাষা মাত্র । মনে রাখতে হবে ভাষাবিদ গ্রিয়ার্সনের ভাষাভিত্তিক বিভাজনের উপর নির্ভর করেই এক সময় ভারতের প্রদেশ বিভাজন হয়েছিল । তাই ভাষা আর প্রদেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত

সংবিধানের ৩৪৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – “ Articale 345 : Official language or languages of a State—subject to the provisions of articles 346 and 347 , the legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the Language or Languages to be used for all or any of the official purposes of that State : Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those officilal purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.2

অর্থাৎ প্রতিটি প্রদেশের বহুলচর্চিত ভাষা ব্যবহৃত হবে আর সঙ্গে থাকবে হিন্দি ও ইংরাজি। এই নির্দেশ সামনে রেখেই ভারতীয় রেল দপ্তর প্রতিটি স্টেশনের নামে ভাষার ত্রিলিপি রূপ মেনে চলেছে।

মাতৃভাষা নিয়ে প্রতিটি সচেতন মানুষের গর্বের শেষ নেই । বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালি গর্বিত। এই ভাষা তো শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ,অরুণাচলপ্রদেশ,নাগাল্যান্ড,মিজোরাম,ত্রিপুরা ,মেঘালয় ,আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বহুল প্রচলিত। তাছাড়া ঝাড়খণ্ড,বিহার,আসাম,দিল্লী,সিকিম, ছত্রিশগড়ে অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলার চল আছে। ভারতের বাইরে বাংলাদেশে তো পুরোটাই বাংলা। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সিঙ্গাপুর সরকার তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবছর ‘ও’ এবং ‘এ’ লেবেল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। শিশু বিভাগ থেকেই বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক। অথচ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সর্ব স্তরে আমরা তা করতে পারিনি।

আফ্রিকা মহাদেশের একটি ছোট্ট দেশ সিওরা লিওন। এই দেশের সরকার ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের শান্তিবাহিনীর সম্মানার্থে ইংরাজির সঙ্গে বাংলাকেও তাদের দেশের সরকারি ভাষা ঘোষণা করেছে। ২০১১ সালে রাস্ট্রসংঘ বাংলাভাষাকে ‘সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অব দি ওয়ার্ল্ড ‘বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন। দেশে-বিদেশের এই চর্চা স্তরে বাংলাভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হোক – এই দাবি করার সময় আসেনি। আসবে কিনা জানি না। কারণ আমরাই তো অন্য ভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি। মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে ফেলছি।

২০১০ সালে ২৫ শে জানুয়ারি টি এন এন থেকে একটি খবর অনেককে চমকে দিয়েছিল । খবরের হেডিং করা হয় – There’s no national language in India : Gujarat High Court . হয়েছিল কি – ২০০৯ সালে সুরেশ কাছারিয়া গুজরাট হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে এই আবেদন করেন যে ভারতবর্ষে উৎপাদিত সমস্ত পণ্যের গায়ে জাতীয় ভাষা হিন্দিতে পণ্যের মূল্য,প্রস্তুতের উপকরণ, তারিখ ইত্যাদি লিখতে হবে এবং এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উৎপাদনকারীকে নির্দেশ দিবেন। কিন্তু গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস জে মুখোপাধ্যায় এ এস দাবের মিলিত বেঞ্চ সুরেশবাবুর আবেদন নাকচ করে দেয়। আসলে সংবিধান হিন্দিকে কেন্দ্র সরকারের আধিকারিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছে, কিন্তু জাতীয় ভাষা নয়। হিন্দি ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা বলে আজও সরকার কোনো নোটিফিকেশন জারি করেনি। এই ভাষার প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। একটা বাস্তব সত্যকে তুলে ধরাই এ লেখার উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র –

1. Constitutional Provisiions, Official Language Related Part-17 of the Constitution of India , Chapter I – Language of the Union.

2. Constitutional Provisiions, Official Language Related Part-17 of the Constitution of India , Chapter II – Regional Languages

মানিকদত্ত ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল : প্রসঙ্গ

তুলনামূলক আলোচনা গৌতম মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও রচিত বাংলা সাহিত্যের ধারা হল মঙ্গলকাব্যের ধারা।এই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান লক্ষ্য হল দেবতার মাহাত্ম প্রচার।তবুও এই কাব্যগুলিতে মধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।এছাড়া কাব্যগুলির রচনাশৈলী এবং ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র আমাদের আরোও বেশী অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে লৌকিক গ্রামীণ সংস্কার আর্‍্যেতর দেববিশ্বাস এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ক্রমে ক্রমে সমন্বয় লাভ করেছিল।ফলে মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে বিষয়ের দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি-একটি লৌকিকধারা আর একটি পৌরানিকধারা।লৌকিকধারায় 'মেটার অফ বেঙ্গল' আর পৌরাণিকধারায় 'মেটার অফ সংস্কৃত ওয়ার্লড' যার অবলম্বন।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা-'মনসামঙ্গল' 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং 'ধর্মমঙ্গল'।মনসামঙ্গল সব চাইতে আদি আর তার পরেই চণ্ডীমঙ্গল।চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিকদত্ত এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি-একটি ক/আখেটিক খণ্ড, এখানে রয়েছে কালকেতুর আখ্যান।আর একটি খ/বনিক খণ্ড, এখানে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত-ক/সৃষ্টিকথা বা দেবখন্ড খ/ আখেটিক খণ্ড গ/বণিক খণ্ড।কাহিনি আলোচনায় মানিকদত্তের সঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর যেমন মিল রয়েছে তেমনি অমিলও রয়েছে। দুজনের কাব্যেই আমরা উপরের এই খণ্ডগুলির পরিচয় পেয়ে থাকি, সেদিক থেকে দুজনেই প্রায় মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখেছেন।আবার দুজনের কাব্যের চরিত্রগুলিও বেশ বাস্তবসম্মত হয়েছে।তবে মানিকদত্ত কবিকঙ্কনের আগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।মানিকদত্ত যে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি সে কথা মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজেই স্বীকার করে বলেছেন-

"যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।

বিনয় করিয়া কবিকঙ্কনে কয়।।"

এর থেকে একথা প্রমানিত হল যে, মানিকদত্তই সর্বপ্রথম চণ্ডীর গান বেঁধেছিলেন।মানিকদত্ত ও কবিকঙ্কন দুজনেই ষোড়শ শতাব্দীর কবি। মানিকদত্তের কালকেতু ও ধনপতির কাহিনি পরবর্তীকালে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও অনুসরণ করেছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি হলেও আদি রচনাকার হিসাবে মানিকদত্তের গুরুত্ব অপরিসীম।

মানিকদত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল এর শুরুতে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। এই সৃষ্টিতত্ত্বে তিনি ভবানির সাতবার জন্ম দেখিয়েছেন।তাঁর পর হিমালয়ে শিবের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর ভবানীকে উদ্দেশ্য করে গানের পালা শুরু করেছেন।অন্যদিকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কাব্যে গণেশ সরস্বতি মহাদেব লক্ষ্মী রাম চৈতন্য এবং চণ্ডী প্রভৃতি দেব দেবীর বন্দনার সঙ্গে দিক বন্দনাও করেছেন, দিক বন্দনার পরে সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে দক্ষযজ্ঞ কাহিনিটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।অন্যদিকে মানিকদত্ত দক্ষযজ্ঞের কাহিনি আলোচনার স্থান দেননি।মানিকদত্তের গৌরীকে পাই হিমালয়ের পালিতা কন্যা রুপে।হরিব্রাহ্মনের গৃহে গৌরীর জন্ম হলে সে বুঝতে পারলেন সে আসলে দুর্গা।সে দুর্গা হরিকে ভাণ্ডিতে এসেছে।সেই কারনে হরি দুর্গাকে হাণ্ডিতে করে জলে ভাসিয়ে দেয়।কবিকঙ্কনের রচনায় দেখা যায় হিমালয় কন্যা পাঁচ বছর পরেই চণ্ডী আখ্যা পেয়েছিলেন।মানিকদত্ত এক্ষেত্রে লৌকিক কাহিনির উপর বেশি পরিমাণে নির্ভর হয়েছেন।আর মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীর বর্ণনায় পৌরাণিক কাহিনির উপর নির্ভর করেছেন।শিব গৌরীর বিবাহ প্রসঙ্গ দুজন কবির রচনায় প্রায় একই রকম ভাবে পাওয়া য়ায়।য়েমন মদনভস্ম রতিরখেদ আবার নারদ ভূমিকা রতির প্রতি দৈববানী।এক্ষেত্রে মুকুন্দরাম যেমন সংস্কৃত প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মানিকদত্ত কিন্তু সেরকম কোন প্রভাবের কথা বলেননি বললেই চলে।শিব পার্বতীর বিয়ের ক্ষেত্রে নারীগণের পতি নিন্দা অংশটি উল্লেখযোগ্য।এই অংশটি মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া গেলেও মানিকদত্তের কাব্যে পাওয়া যায় না।আবার গণেশের জন্ম দেবীর শরীরের ময়লা থেকে তা দুজন কবির কাব্যে একই।

কবিকঙ্কনের কাব্যে বিশেষ অংশ যেমন মেনকার সঙ্গে গৌরীর কলহ, শঙ্করের ভিক্ষা,হরগৌরীর কলহ প্রভৃতি বাঙালি ঘরের পরিচিত চেনা ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়।শিবের ঘরজামাই, সেই সঙ্গে মাতা মেনকার সঙ্গে গৌরীর কলহ বিশেষ উপভোগ্য।নিষ্কর্মা শিবের প্রতি বিরূপ হয়ে মেনকা কন্যার নিকট অভিযোগ করে বলেছেন-

"রান্ধি-বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।

ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।"

গৌরী মাতা মেনকার কথা শুনে অত্যন্ত অপমানিত হলেন।আর সেই সঙ্গে জবাব দিতে আর দেরি করলেন না। তিনি বললেন-

"জামাতারে পিতা মোর দিল ভুমিদান।

তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান।।

রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।

আজি হৈতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা।।"

মানিকদত্তের কাব্যে এই সমস্ত ঘটনাগুলো সুসংবদ্ধ নয়।বরং প্রায় অনুপস্থিত। তারপর মানিকদত্ত ঘট স্থাপন করে গান আরম্ভ করেছেন। এরপর অসুরের জন্ম, বিষ্ণুর যুদ্ধ এবং দেবীর সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কালীমূর্তি ধারণ করে সমস্ত অসুরদের ধ্বংস করেছেন।কালীমূর্তির ধারণায় মানিকদত্ত লৌকিক কাহিনির উপর নির্ভর করেছেন-

"ভদ্রকালীর রণ দেখি দেবগণ ভাবে।

ব্রহ্মা বলে এতদিনে সৃষ্টিনাশ হবে।।

সৃষ্টি রক্ষার তরে শিব রণেতে আইল।

উলঙ্গ হইয়া শিব রণেতে শুইল।।"

দেবী চণ্ডী একবার মনে মনে ভাবলেন পদ্মার পূজা প্রচারিত আছে অথচ তার পূজা কেউ দেয় না। তখন পদ্মার কাছে দেবী নিজের পূজা প্রচারের কথা প্রকাশ করলেন। পদ্মা চণ্ডীকে বলেছিলেন ধর্মাসুরের ভয়েই কেউ পূজা দিতে চায় না।অথচ পদ্মা ধর্মাসুরের সেবা করেই নিজের পূজা প্রচার করেছিলেন। ঠিক এখান থেকেই চণ্ডী পুজার প্রচলন হয়েছে তার প্রমান পাওয়া যায় মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকেই।তাছাড়া ধর্মাসুরের প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় পূর্বে এদেশে মনসার পূজা প্রচলিত ছিল।এই ঐতিহাসিক তথ্যটি অবশ্য কবিকঙ্কনের কাব্যে পাওয়া যায় না। বরং কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌরীর দরিদ্র সংসারের অভাব-অনটনই প্রধান হয়ে উঠেছে। পূজা প্রচারের চাইতে নিজের দরিদ্র সংসারের জন্য দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করে পদ্মার কাছে হাহুতাশ করেছেন।পদ্মা গৌরীকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য চেষ্টা চালাতে বললেন।আবার মানিকদত্ত চণ্ডী মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য ধর্মাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন,যুদ্ধে ধর্মাসুর নিহত হয়েছেন।তারপর কলিঙ্গে দেহরা নির্মাণ করেছেন।সবশেষে কলিঙ্গ রাজা কর্তৃক পূজা পেয়েছেন।এরপর মানিকদত্ত নবপুরাণ সৃষ্টি করেছেন।অর্থাৎ দেবী চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি সংগ্রহ করেছেন ইন্দ্রপুরীর কাছ থেকে।সেই পুঁথির অষ্টমাংশ মানিকদত্তের শিয়রে রেখে দেন।তারপর স্বপ্নে মানিকদত্তকে আদেশ দেন পুঁথির মাধ্যমে দেবী চণ্ডীর মহাত্মা প্রচার করে তাকে য়েন মর্ত্যে বিখ্যাত করে তোলা হয়। মানিকদত্ত সে আদেশ যথাযোগ্য পালন করে দেবী মাহাত্ম ও পুঁথির মাহাত্ম প্রচার করতে শুরু করেন।

দেবী প্রদত্ত পুঁথিটি অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল, ফলে মানিকদত্ত একমাস ধরেও পুঁথিটি পড়ে শেষ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে মানিকদত্ত বলেছেন-

"বিস্তর পুঁথি দেখি দত্ত ভাবিল বিশেষ।

কেমনে গাইব এত গীত অষ্ট দিবসে।।

বিস্তর পুঁথি দেখি দত্ত অন্তরে ডরিল।

...

তিনশত বত্রিশ লাচাড়ি রচিলেন গান।

দিশ পাঁচালী কৈল পদ মূর্তিমান।।

এরপর তিনি বাকি অংশ বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন। জানা যায় দেবী মানিকদত্তের অনিহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পুনরায় স্বপ্নে মাহাত্ম প্রচারের জন্য আদেশ করেন। আবার কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে আছে গান রচনার আদেশ। মানিকদত্ত এরপর প্রচারের জন্য কলিঙ্গে যাত্রা করেন। সেখানে রাজার কাছে বন্দী হন। তারপর আবার দেবীর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন। এরপর কলিঙ্গ রাজার অনুরোধে মানিকদত্ত দশভুজা এবং দেবীর ত্রিনয়নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই সমস্ত ঘটনা কবিকঙ্কনের কাব্যে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের তপস্যা, দেবী কর্তৃক পুত্র বরদান মানিকদত্তে পেলেও কবিকঙ্কনে পাই না। নীলাম্বরের জন্ম এবং নীলাম্বরের বিয়ে, বিবাহ বাসরে কোন্দল মানিকদত্তে পেলেও কবিকঙ্কনে পাই না। নিদয়া ও কমলার জন্মকথা মানিকদত্তের কাব্যে পাই কিন্তু কবিকঙ্কনের কাব্যে পাই না। আবার নিদয়ার সাধভক্ষণ অংশটি মুকুন্দরামের কাব্যে থাকলেও মানিকদত্তের কাব্যে এই বিষয়ের কোন আলোচনা পাওয়া যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু যে বনের পশুদের উপর অত্যাচার করেছে সে কথা দুজন কবির কাব্যেই আছে। তবে কাহিনির অনেকাংশেই আবার অমিলও রয়েছে। যেমন কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশুরা সিংহের কাছে আবেদন জানিয়েছে, আবেদনে সাড়া দিয়ে সিংহের সমর সজ্জা তৈরি হয়েছে, তারপর পশুগণের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধে পশুগণের পরাজয় স্বীকার, ব্যর্থতার জন্য পশুদের ক্রন্দন, এসব কাহিনি মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া যায়। সিংহের সমর সজ্জার বর্ণনা করতে গিয়ে মুকুন্দরাম লিখেছেন-

"কোক শাদ্দুল আগে দুই সেনাপতি।

দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বায়ুগতি।।

গণ্ডক বারণ মহিষ সেনাপতি।

পশ্চিমে ধাইল তারা যেন মেঘগতি।।"

আবার পশুগণের পরাজয়ের পর ভালুক ক্রন্দন করে বলেছে-

"উঁইচারা খাই আমি নামেতে ভাল্লুক।

নেউগি চৌধুরী নই না করি তালুক।।"

মানিকদত্তের কাব্যে এই ঘটনার পরিচয় আমরা পাই না। অবশ্য দেবীর নিকট পশুদের প্রার্থনা মানিকদত্তের কাব্যে যেমন আছে তেমনি কবিকঙ্কনের কাব্যেও আছে। দেবীর কৃপায় বন কেটে গুজরাট নগর স্থাপন হলে সেখানে বিভিন্ন গাছপালার কথা কবিকঙ্কনের কাব্যে পাই। মানিকদত্তের কাব্যে এই পরিচয় পাওয়া যায় না। কালকেতুর অনুরোধে গুজরাট নগর নির্মিত হলে সেখানে কলিঙ্গের চারিমণ্ডলকে দেবী স্বপ্নে দেখান কলিঙ্গ ভেঙ্গে গুজরাট নগরে এসে বসবাস করতে। কিন্তু শঠ ভাঁড়ুদত্তের শাসানিতে সে কাজ হয়নি। এখানে যে চারিমণ্ডলের কথা পেলাম তা কবিকঙ্কনের কাব্যে নেই। কবিকঙ্কনের কাব্যে গুজরাট নগরের বর্ণবিন্যাসের কথা আছে, আছে ভাড়ুদত্তের কথা, যা মানিকদত্তের কাব্যে খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। মানিকদত্তের কাব্যে লক্ষ্য করা যায় কালকেতুর যুদ্ধ জয়ের পর দেবী চণ্ডী যখন বিদায় নিতে চাইলেন সেই সময় কলিঙ্গ রাজা দেবীর পুজার আয়োজন করলেন। এই সময় কালকেতুর ভাগ্যেও দুর্ভাগ্য নেমে আসে। কারণ দেবী পূজা পাওয়ার পর সন্তুষ্ট হলেন আবার সেই সঙ্গে সুরথ রাজাকে আদেশ দিলেন কালকেতুকে বন্দী করার জন্য। কিন্তু রাজা এই কথা শুনতে না পেলেও শুনতে পেলেন পুরোহিত। এই সুযোগে ভাঁড়ুদত্ত গিয়ে কৌশলে কালকেতুকে বন্দী করলেন। কবিকঙ্কনের কাব্যে এই ধরনের ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

মানিকদত্তের কাব্যে আরও দেখা যায় কেলকেতু কলিঙ্গ রাজার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার পর ভাঁড়ুদত্তকে শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত উল্টে কালকেতুকে আঁটকুড়া বলে গালি দিলে কালকেতু সন্তান লাভের আশায় ফুল্লরার সঙ্গে তপস্যায় যেতে চায়। দেবীর কৃপায় কালকেতুর পূর্ব জীবনের কথা মনে পড়লে অগ্নিকুণ্ডে প্রান বিসর্জন দেয়। তারপর দেবী কালকেতু ও ফুল্লরাকে ইন্দ্রের নিকট সমর্পণ করেন। আবার কবিকঙ্কনের কাব্যে পাই কালকেতুর পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার দিয়ে মর্ত্য ত্যাগ করে। যেমন-

"এমত শুনিয়া সব রাজার বচন।

পুস্পকেতুর হাতে কৈল সমর্পণ।।

স্বর্গ যার বলিবীর দিলেন ঘোষণা।

ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল ক্রন্দনা।।"

'বনিক খণ্ডে' মানিকদত্ত কর্ণমুণিকে স্বর্গভ্রষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছিলেন মিথ্যার আশ্রয়ে। মানিকদত্ত ধনপতিকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এনেছেন। আবার ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে স্বর্গে পাঠিয়েছেন। ধনপতির দ্বিতীয় স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের জন্য বিচ্ছেদ বেদনার মধ্য দিয়ে দিনপাত করেছেন। অন্যদিকে কবিকঙ্কন ধনপতিকে বিত্তবান করে অঙ্কন করেছেন। এর ফলে মানিকদত্তের কাব্যের বিচ্ছেদ বেদনার ভার কিছুটা লাঘব হয়েছে।

মানিকদত্তের কাব্যে লহনা ও সতীন খুল্লনার মধ্যে যে ঈর্ষার বিবরণ পাই তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এখানে দুর্বলা দাসীর কুমন্ত্রণা খুব একটা চোখে পড়ে না বরং খুল্লনার প্রতি একটু সহানুভূতিই ছিল। আবার কবিকঙ্কন দেখিয়েছেন লহনার সঙ্গে খুল্লনার ব্যবহার প্রথম দিকে ভালোই ছিল। ধনপতি যখন গৌড়ে তখন দুর্বলা দাসীর চক্রান্তে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। এর ফলেই খুল্লনার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কবিকঙ্কনে দুর্বলার চালাকি বিদ্যমান, মানিকদত্তে সে চালাকি নেই। কবিকঙ্কনে রম্ভাবতীর পুত্র ময়াইকে খুল্লনার নিকট যেতে বললে সে যায়নি, কারণ খুল্লনার দুঃখ দুর্দশা সে দেখতে চায়নি। আবার মানিকদত্তের কাব্যে রম্ভাবতীর হরিবন্যা ভগ্নির সঙ্গে বনের মধ্যেই দেখা করেন। খুল্লনা হরিবন্যার কাছ থেকে বস্ত্র অলংকার গ্রহণ করে। মানিকদত্তের কাব্যে দেখা যায় খুল্লনা যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পেতে বনের বাঘ, ভালুক, আর সাপেদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল তাকে যেন ভক্ষণ করা হয়। কিন্তু খুল্লনা যেহেতু দেবীর আশীর্বাদ ধন্য সেই কারনে কেউ ভক্ষণ করতে রাজি হয়নি। মানিকদত্তের চণ্ডী ধনপতির বেশ ধারণ করে খুল্লনাকে স্বপ্ন দেখান যে তার সঙ্গে সে মিলিত হতে চায়। আর কবিকঙ্কনে দেবীর কৃপা ছাড়াই খুল্লনা স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

কবিকঙ্কন ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধে কংসের জন্ম কথা এবং সীতা চরিত্রের সন্দেহের কথা বেশ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এদিকে মানিকদত্তের কাব্যে কোথাও হরিবংশের কথা এবং রামায়ণের কথা নেই। ধনপতির সিংহল যাত্রার সময় লহনা যে কথা বলেছিল তা কবিকঙ্কনে যেমন পাই মানিকদত্তে তেমন পাই না। কবিকঙ্কনের লহনা বলেছে-

"তোমার চরণে দুর্গা মাগি এ বর।

পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর।।

...

জিয়ন্ত পতিতে যার কিছু নাহি সুখ।

সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ।।"

এই একই কারনেই মানিকদত্তের লহনা বলেছে-

"প্রভু তথা গেলে পাইবা দুখ দেখহ কামিনীর মুখ

সর্বস্ব রাজার তরে দিয়া।

স্ত্রীর বচনে তুমি থাক ঘরেতে বসিয়া।"

মানিকদত্তের কাব্যে ধনপতি কমলেকামিনীর কথা বললে রাজা শালবন দরবারে বসেই ধনপতিকে বন্দী করার কথা বলে। আবার কবিকঙ্কনে পাই রাজা কমলেকামিনীর কথা শুনতে পেয়ে নিজে সাক্ষ্য প্রমান গ্রহণের জন্য কালিদহে গিয়েছিল। কবিকঙ্কনে সাক্ষ্য গ্রহণ ছিল এই রকম-

"সাধুর বচন শুনি বলে কর্ণধার।

আমি নাহি দেখি হেথা কামিনীকুঞ্জর।।"

আবার এই কথাই মানিকদত্তের কাব্যে পাওয়া যায় একটু অন্য ভাবে-

"কাণ্ডার বলেন রাজাবলি সত্যবাণী।

চক্ষে নাই দেখি কমল শুন্যাছি জবানী।।"

রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় কবিকঙ্কনের কালকেতু উপাখ্যানে তৎসম শব্দের বাহুল্য। আবার ধনপতি উপাখ্যানে তৎসম শব্দের বাহুল্য নেই বললেই চলে। মানিকদত্তের ক্ষেত্রে দেখি দুটি কাহিনিতেই ভাষা লোকভাষা। কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রভাব নেই।

মানিকদত্ত যেহেতু আদি কবি সেহেতু কবিকঙ্কন তাঁর কাব্যের দ্বারা কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছেন। যদিও কবিকঙ্কনের কাব্য রচনার পর মানিকদত্তের জনপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে কমে গিয়েছিল। দুজনের কাব্যে কোথাও কোথাও অমিল দেখা গেলেও পরিপূর্ণ রস গ্রহণে দুজনের কাব্যকেই সমান গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিৎ।

গ্রন্থ সায়কঃ

১/ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (দ্বিতীয় খণ্ড) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২/ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন।

৩/ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, অশোককুমার মিশ্র।

৪/ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৫/ মধ্যযুগের ধর্ম ভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৬/ মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সুশীলকুমার ওঝা।

৭/ কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল, দেবেশকুমার আচার্য।

সৃষ্টিই স্রষ্টার মৌলিকতার বাহক : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল

জয়ন্ত মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

মনসামঙ্গল কাব্যধারার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব প্রথম এই কবির কাব্যটি ছাপাখানার যুগে মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যটি মূলত পাঁচটি পালায় বিভক্ত। এই পাঁচটি পালা হল - ১/ মথন পালা ২/ ঊষাহরণ পালা ৩/ রাখালপূজা পালা ৪/ ধন্বন্তরি পালা এবং ৫/ বেহুলা লখিন্দর পালা। কিন্তু এই পাঁচটি পালাকে কোথাও একত্রিত ভাবে পাওয়া যায় না। এর ফলে বেহুলা লখিন্দর পালাটিই তাঁর প্রধান পালা হিসাবে পাঠক সমাজের কাছে অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মূল আখ্যান চাঁদ সদাগরের বৃত্তান্ত যা বেহুলা লখিন্দর পালার উপজীব্য বিষয়। মনসামঙ্গলের সকল কবির কাব্য একটি নির্দিষ্ট রেখায় প্রবাহমান হলেও এর মধ্যেই আবার অনেক কবি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের কবিত্ব শক্তিকে কালবিজয়ী করে তুলেছেন। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও এই কালবিজয়ী কবিত্ব শক্তির অধিকারী। একই কাহিনি নিয়ে তিনি মনসামঙ্গল কাব্যটি রচনা করলেও এর মধ্যে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদ, মনসার রুষ্ট ও বিষাক্ত রূপ, বেহুলার সতীত্ব ও পতিব্রতা প্রভৃতি চরিত্র ও ঘটনাবলী সৃষ্টির মধ্যে নিজের মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষের কাছে তাঁর কাব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মূলত পশ্চিমবঙ্গের কবি। কবির যে আত্মবিবরণী পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর কাব্যটি রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে। কবি ক্ষেমানন্দ যে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের পরবর্তী তারও প্রমান পাওয়া যায় নিজের দেওয়া আত্মবিবরণী থেকে। কেননা, কবি ক্ষেমানন্দ হুবহু মুকুন্দরামের দেওয়া আত্মবিবরণী কৌশল অনুকরণ করেছিলেন। আবার কবি ক্ষেমানন্দকে রামায়ণের ভক্ত কবিও বলা হয়। কারণ তাঁর কাব্যের মধ্যে রামায়ণের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায়। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, সীতা রামের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের বনবাসে গিয়েছিল আর বেহুলা স্বামীর প্রান বাঁচাতে মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় করে ছয় মাসের জলপথে যাত্রা করেছিল।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম নিয়েও এক সময় সমালোচক মহলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে মনে করেন কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ নামে দুজন কবি এই কাব্যটি রচনা করেন। অনেক গবেষণার পর এই উক্তি ভুল প্রমানিত হয়। কেননা কবির মতে কেয়াপাতায় মনসার জন্ম বলে তার এক নাম কেতকা। আবার কবি যেহেতু কেতকার দাস, তাই কবির নামের আগে কেতকাদাস বসানোই সম্ভব। ফলে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দুজন কবি নন, পুরো নামটি একজন কবির। এরকম দ্বিত্ববোধ সৃষ্টির কারণ হল তাঁর কাব্যের কোথাও কেতকাদাস আবার কোথাও ক্ষেমানন্দ পাওয়া যায়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, একটি কাব্য যদি দুজন কবির হাতে রচিত হয় তাহলে সেখানে দুরকম বৈশিষ্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু এই কাব্যটি পাঠ করে যে অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় সমগ্র কাব্যটি একজনেরই রচনা।

ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তাঁরা ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল এবং ছোট ভাই অভিরাম। চন্দ্রহাসের পুত্র বলভদ্রের তালুকে ছিল তাঁদের বাস। এই সময় সেলিমবাদ পরগণার ফৌজদার বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হলে দেশে অরাজকতা বেড়ে যায়। এই সময় আস্কর্ণ রায়ের পরামর্শে সপরিবার গ্রাম ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় জগন্নাথ পুরের নীলাম্বরের গৃহে। এখানে আশ্রয় লাভের পর রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তিনটি গ্রাম দিলেন বসবাস করার জন্য। কবি তাঁর আত্মবিবরণীতে লিখেছিলে-

"রণে পড়ে বারাখাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ

যুক্তি করি জননী জনক।

দিন কতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই

দেয়ানে হইল বড় ঠক।।

শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায় অনুমতি দিল তায়

যুক্তি দিল পালাবার তরে।

শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি

গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতর।।

...

নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথ পুর পাই

প্রাতঃকাল নিশি অবসান।

তথায়তে নীলাম্বর উত্তরিতে দিল ঘর

হাঁড়িচাল সিদা গুয়া পান।।

রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই

নাম তাঁর ভারমাল্ল (খান)।

তিনি দিলেন ফুল পান আর তিন খানি গ্রাম

লিখাপড়া বসতির স্থান।।" (মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ-২৮৫)

মঙ্গলকাব্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট হল গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বর্ণনা। এক্ষেত্রে সকল কবিই গ্রন্থ রচনার কারণ হিসাবে দেবীর আদেশের কথা বলেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ক্ষেমানন্দ তাঁর ভাইকে নিয়ে খড় কাটতে গিয়ে একদল ছেলে দেখতে পেলেন যারা জলসেচ করে মাছ ধরছিল। সেই দলে ঢুকে অনেক বিবাদ করে সমস্ত মাছ কেড়ে নিয়েছিলেন। সকল ছেলেরা চলে গেলে কবি মুচিনীর বেশে এক স্ত্রীলোক দেখতে পান। এই মুচিনীই আসলে মাতা বিষহরি। ক্ষেমানন্দের সঙ্গে কপট চাতুরী করতে এসেছিল। এই বিষহরি শেষ পর্যন্ত কবির সকল সংশয় দুর করে নিজের আসল রূপ ধরে। দেবীর এই রূপের কথা কেউ যেন জানতে না পারে সেটাও সাবধান করে দিলেন। কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন-

"যেরূপ দেখিলা দৃষ্টে মানা কৈল প্রকাশিতে

কহিলে না হইবে তোর ভাল।

ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ

আমার মঙ্গল গ্যায়া বোল।। " ( মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ- ২৮৭ )

এরপর থেকেই ক্ষেমানন্দ মনসার মঙ্গলময় গীত লিখতে আরম্ভ করেন। ক্ষেমানন্দের এই কাব্য গীতের ভাষা এত সহজ সরল যে, পাঠক এই কাব্যটি পাঠ করে সহজেই রসাচ্ছাদন করতে পারে।

ক্ষেমানন্দের বেহুলা লখিন্দর পালা নামের যে পঞ্চম পালাটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এই পালাটি শুরু হয়েছে সদাগর ও মনসার বিবাদ দিয়ে। কেননা মনসার পূজা যদি মর্ত্যে প্রচার করতে হয় তাহলে দেখা যায় মনসা সদাগরের হাতে পূজিত হলে অনায়াসেই অন্যান্য লোকের কাছেও পূজিত হবে। মনসার জন্ম যেহেতু কেয়াপাতায় এবং সদাগর শিবের ভক্ত, ফলে সদাগরের পক্ষে মনসার পূজা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এই পালায় যতগুলো ঘটনার সংযোজন পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটি ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে চাঁদ সদাগর ও মনসার শত্রুতা-মিলনের মধ্যে। মনসার পূজা এক রকম জোর করে আদায় করা হয়েছে ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বনিক সদাগরের কাছ থেকে। মানুষ যেদিকে স্বার্থের গন্ধ পায় সেদিকেই ছুটে বেড়ায়। কিন্তু সদাগর সে কাজ করেনি। মনসাকে প্রথম দিকে মেনে নিলেই তার জীবনে এত সমস্যা দেখা যেত না। সদাগর যেহেতু আপন ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী, তাই সে কোন মতেই কানী চেঙমুড়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি।

মনসার কোপে সদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যু হলেও সে ভেঙ্গে পড়েনি। সমস্ত শোক ভুলে গিয়ে সে আবার নতুন করে বানিজ্য যাত্রার বন্দোবস্ত করছে। সদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে চম্পক নগরে অশান্তির ছায়া বিরাজ করলেও সদাগর পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। হেঁতালের লাঠি ব্যবহার করে যাতে সে মনসাকে উচিৎ শিক্ষা দিতে পারে। চম্পক নগরবাসি যেমন সদাগরের ছত্র ছায়ায় বসবাস করে তেমনি সদাগরও সর্বদা চেষ্টা করে চম্পক নগরকে সুখ স্বাচ্ছন্দের সাম্রাজ্যে পরিণত করতে। এই অংশে লেখক সদাগর সম্পর্কে বলেছেন-

মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।

বলে চেঙমুড়ী বেটী কিসের দেবতা।।

হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফেরে।

মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে।।

বলে একবার যদি দেখা পাই তার।

মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর।।

আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।

পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি।। (ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, পৃ- ১)

সদাগর ছয় পুত্র শোক ভুলে দক্ষিণ পাটনে আবার যাত্রা করল বানিজ্যের উদ্দেশ্যে। শিবের মন্ত্র জপ করতে করতে সপ্ত ডিঙ্গা ও কাণ্ডারিসহ সদাগর কালিদহে গিয়ে উপস্থিত হল।

কালিদহে মনসার প্রতারণায় হনুমান সমস্ত মেঘ নিয়ে গিয়ে চাঁদের নৌকাডুবি ঘটাল। চাঁদ নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে তার সমস্ত নৌকাগুলো একে একে জলে দুবে যাচ্ছে। চাঁদ সদাগর মনসার নাম একবার উচ্চারণ করলেই হয়ত তার এই সর্বনাশ হত না। সদাগর আসলে পৌরুষের প্রতীক। ফলে কোন ভয়ই তার অন্তরাত্মাকে কাঁপাতে পারেনি। ঝড় তুফান যত বাড়তে থাকে চাঁদের মনবল ততই দৃঢ় হতে থাকে। হনুমান মনসার আদেশে সদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা ডোবাতে শুরু করলে সদাগর বলেছে-

যা করেন শিবশূল এবার পাইলে কুল

মনসাকে বধিব পরাণে।

যত বলে বেনিয়া এই সব শুনিয়া

কোপে জ্বলে বীর হ্নুমানে।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৪)

হনুমানের তাণ্ডবে যথারীতি সদাগরের সাত ডিঙ্গা কাণ্ডারি সকলেই জলে ডুবে যায়। সদাগর জলে ডুবে জল খায়, আবার ভেসে উঠে কানী চেঙমুড়ী বলে গাল দেয়। সাঁতার কাটার সময় সদাগর মনসার কৃপায় পদ্মফুল দেখতে পেল। কেয়াপাতায় মনসার জন্ম বলে সদাগর সেই ফুল স্পর্শ করল না। শেষে ভেলায় চেপে শিবের নাম জপ করতে করতে উলঙ্গ অবস্থায় পাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

চম্পক নগরের সদাগর যে কিনা ধনে ও ঐশ্বর্যে সবথেকে শক্তিশালী সেই সাধু সর্বস্ব হারিয়ে আজ ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করছে। সাধুর বাক্য অমৃত সমান। যে মুখে শিবের নাম উচ্চারণ করেছে সেই মুখে প্রান গেলেও মনসার নাম উচ্চারণ করবে না। ভিক্ষা করতে গিয়ে সাধু সবাইকে নিজের আসল পরিচয় দিলেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। সদাগরের দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করে লেখক বলেছেন-

মাগে বাড়ি বাড়ি পায় চাউল কড়ি

ধান্য পাইল আড়ি দুই।

পাইয়া ভাঙ্গা ঘর চাঁদ সদাগর

তার কোণে চাল থুই।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৭ )

সদাগরের এখানেও স্থান নেই। মনসা গণেশের সাহায্যে ইঁদুর পাঠিয়ে সাধুর সঞ্চিত ধান খালের মধ্যে নিয়ে যায়। এর ফলে সদাগর মনের দুঃখে বনে গমন করে। বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় বন্ধু চন্দ্রকেতুর সঙ্গে দেখা হয়। সাধুর এই দুরাবস্থার কথা চন্দ্রকেতু জানতে চাইলে এর উত্তরে-

চাঁদবেনে বলে মিতা কি কব দুঃখের কথা

বিধি বাম লিখিল কপালে।

কানী চেঙমুড়ী বেটী পুত্র মোর খাইল ছটি

সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।।

ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রান রক্ষা কইল ত্রিনয়ন

দুই মিতায় তাই হৈল দেখা।

সদাগর বলে মিত কিছু মোর কর হিত

বিপদের কালে হও সখা।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৯ )

চন্দ্রকেতু মনসার ভক্ত। চাঁদের মুখে মনসার দুর্নাম শুনে শেষ পর্যন্ত অপমান করে চন্দ্রকেতু তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মনের দুঃখে চাঁদ বনের কাঠুরিয়াদের কাঠ সংগ্রহ করতে যায়। কাঠের বোঝা মাথায় নিলে সেখানেও মনসার প্রতারণায় কাঠের বোঝা ফেলে পালাতে হয়। দ্বিজবর নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালের কাজ করতে যায়। কিন্তু কৃষিকাজ তার জানা না থাকায় অন্যগাছ রেখে ধানগাছ মারে। দ্বিজবরের চর খেয়ে সাধু শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

চাঁদ তার নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিজের বাড়িতে আসতে সাহস পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করে বাড়ির পাশে কলার বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলে চোর হিসাবে ধরা পড়ে। বাড়ির চাকর নেড়া চোর মনে করে উত্তম মধ্যম দিতে থাকে। কবি এখানে বলেছেন-

মার খেয়ে চাঁদবেনে হইল কাতর।

আর না মারিও নাড়া আমি সদাগর।।

এতেক শুনিয়া তার রাখিল পরান।

প্রদীপ আনিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ২০ )

নিজ স্বামীর এমন দুরাবস্থা দেখে সনকার চোখের জল আর বাঁধন মানল না। কিন্তু সে তো সপ্ত ডিঙ্গা নিয়ে বানিজ্যে বেরিয়েছিল, তাহলে তার এমন অবস্থা হল কি করে। সনকা অনুরোধ করে সপ্ত ডিঙ্গার কথা জিজ্ঞাসা করলে এবার সাধু সমস্ত খুলে বলে-

আমি নাহি জানি চেঙমুড়ী কানী

দুঃখ দিল নানা পাকে।

হৈল ভরাডুবি বাঁক দিল পড়ি

জল খাই নাকে মুখে।।

প্রভুর চরণে কহে সকরুণে

কহে কীর্তি কিবা সাধ।

ছয়পুত্র মৈল ভরাডুবি হৈল

দেবী মনসার বাদ।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ২১ )

এই পর্যন্ত দেখা যায় যে, সদাগর অনেক দুঃখের মুখোমুখি হয়েও মনসার প্রতি শ্রদ্ধা রাখেনি। ছয় পুত্রের মৃত্যুশোক যে কাটিয়ে উঠতে পারে তার কাছে আর কোন ভয় থাকতে পারেনা। সদাগর যথারীতি লখিন্দরকে পেয়ে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। ঘটকের মাধ্যমে কন্যা দেখা দেখি শুরু হয় ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বিয়েও দেয়। এর পরের কাহিনি আমাদের সকলের জানা আছে। শেষে শুধু মনে রাখতে হবে যে, বেহুলার সতীত্বে লখিন্দর, পূর্বের মৃত ছয়পুত্র এবং চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরে পেয়ে তারপর সদাগর মনসার পূজা করেছে। সকলে মিলে সদাগরকে মনসার পূজা করতে অনুরোধ করলে উত্তরে সদাগর বলেছে-

বাদ বিসম্বাদ ছিল যার সনে কালি।

কোন লাজে লইব তাহার পদধূলি।।

চেঙমুড়ী বলিয়া যাহারে দিতাম গালি।

কোন মুখে তার আগে হব কৃতাঞ্জলি।।

এই বড় অপমান হইল আমার।

কেমনে পুজিব পদ দেবী মনসার।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ১১২ )

সদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার পূজা করেছিল একথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে এখানে তার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র করে দেখা যাবে না। কেননা প্রতিটি মানুষ সাংসারিক সুখের মধ্যে কাটাতে চায়। মনসার পূজা করে যদি সবাইকে নিয়ে সুখে থাকা যায় তাহলে মনসার পূজা করতে অসুবিধা কোথাও নেই। তাছাড়া যে বেহুলা মৃত স্বামীকে জীবিত করে আনতে পারে তার কথার মূল্য না দিয়ে সদাগর পারেনি। এজন্য তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে একথা মনে না করাই যুক্তি সঙ্গত হবে।

কবি ক্ষেমানন্দ মনসার যে রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ রূপটি বর্ণনা করেছেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে তা প্রশংসার যোগ্য। মনসার এই রুষ্ট রূপের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল সদাগরের পূজা ও শ্রদ্ধা লাভ করা। মনসার আচার আচরণ যদি সহজ সরল হত তাহলে কখনই সম্ভব হত না সদাগরের মত ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বনিকের পূজা লাভ করা। মনসা জন্মের পর থেকেই ছিল অবহেলিত। স্বর্গের দেবতাদের আসনে তার সম্মানের জায়গা ছিল না। ফলে তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মর্ত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। আবার কোন বিশেষ অঞ্চলে নিজের কীর্তি ও মহিমা প্রচার করতে গেলে উক্ত অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রথমে শ্রদ্ধা লাভ করা প্রয়োজন। একারণেই মনসার দৃষ্টি পড়ে সর্ব প্রথম চম্পক নগরের বেনে চাঁদ সদাগরের উপর। সদাগর এতদিন শিবের পূজা করা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। সদাগরের এই ব্যবহারে মনসার রূপ রুষ্ট থেকে রুষ্টতর হয়ে উঠে। যেনতেন প্রকারেণ সদাগরের পূজা লাভ করাই মনসার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

শিব শিব বলে সদাগরের বানিজ্যযাত্রা মনসা মেনে নিতে পারেনি। সদাগর বানিজ্য যাত্রা শুরু করলে মনসা উপায় না পেয়ে নেতাকে নিয়ে পরিকল্পনা করে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে করেই হোক, সদাগরকে ভরাডুবির বিপাকে ফেলতেই হবে। মানুষ বাঁচার তাগিদে অনেক কিছুই করে। তাছাড়া মনসাকে অসম্মানের সঙ্গে সর্বদা কানী চেঙমুড়ী বলে সম্ভোধন করত। চাঁদের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে মনসা বলেছে-

নিরন্তর বলে মোরে কানী চেঙমুড়ী।

বিপাকে উহারে আজি ভরাডুবি করি।।

তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর।

অবিলম্বে ডাকিল যতেক জলধর।।

হনুমান বলবান পরাৎপর বীর।

কালিদহে কর গিয়ে প্রবল সমীর।।

পুষ্পপান দিয়া দেবী তার প্রতি বলে।

সাত বেনের সাত ডিঙ্গা ডুবাইবে জলে।।

এই উক্তি থেকেই প্রমানিত হয় যে, সদাগর যতদিন পর্যন্ত মনসার পূজা না করে ততদিন সদাগরের রেহাই নেই। সদাগরের বিপদের সঙ্গী কেউ নেই, কিন্তু মনসার সঙ্গীর তো অভাব নেই। হলও তাই। হনুমানের সহযোগিতায় সদাগরের সমস্ত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিয়ে সদাগরকে উলঙ্গ করে ছাড়ে। সদাগর ভেলার সাহায্যে উলঙ্গ অবস্থায় কিনারায় এসে আশ্রয় নিলে সেখানেও মনসা চলে সদাগরকে লজ্জা দিতে। পাঁচ সাত জন কুলবধূ সঙ্গে নিয়ে মনসা পরম সুন্দরীবেশে জল আনতে যায় সেখানে যেখানে উলঙ্গ অবস্থায় চাঁদ এসে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে লেখক বলেছেন-

বিবসন চাঁদবেনে ভাসিতেছে জলে।

পরাতে মড়ার কানি বিষহরি চলে।।

পরমা সুন্দরী রুপে দিতে নারি সীমা।

সাত পাঁচ কুলবধূ সঙ্গে রামা।।

...।

যে স্থানেতে চাঁদ বেনে বিবসন বসে।

সেইখানে উপস্থিত চক্ষের নিমেষ।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৬ )

সর্বশান্ত সদাগরকে দেখে মনসার মনে কিছুমাত্র মায়া হয়নি। তাই সদাগর যেখানেই যায় মনসাও কোন না কোন ভাবে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সদাগর সবকিছু কালিদহের জলে ডুবিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে কাঠুরিয়াদের সঙ্গে কাঠ কাটতে গিয়েও তার রেহাই নেই। কেননা সদাগর কাঠ বিক্রি করতে পারলে নিজ দেশে চলে যাবে। একবার নিজের দেশে চলে গেলে মনসার মনস্কাম কখনই পূর্ণ হবেনা। এখানে মনসা হুনুমানের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। মনসার ডাকে সাড়া দিয়ে হুনুমান এলে মনসা তাকে বলেছে

সীতা উদ্ধার কালে পবন নন্দন।

রামহিতে রাবনের সনে কৈলে রণ।।

কাষ্ঠ বোঝা লয়ে দেখ চাঁদবেনে যায়।

তুমি গিয়া চাপ তার কাষ্ঠের বোঝায়।।

অধিক না দিয় ভার সাধু পাছে মরে।

তবে ত আমার পূজা হবে না সংসার।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ১২-১৩ )

অনেক কষ্টের পর সদাগর মনসার কোপ থেকে রক্ষা পেয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্য চলেছে। চাঁদের বাড়ি ফেরা দেখে মনসা ছদ্মবেশে সনকাকে সাবধান করে দিয়েছে যে, তার বাড়িতে আজ চোর আসার সম্ভাবনা আছে। এই কথা শুনে সনকাও সতর্ক হয়ে যাবে। মনসা গনকের বেশধরে সনকার কাছে গিয়া বলেছে-

সাম্প্রতি তোমার বাটি আজি হবে চুরি।।

মাথায় নাহিক চুল পরিধানে টেনা।

সাবধানে থাকিবে আসিবে একজনা।

ধরিয়া তাহারে মারি করিবে তাড়ন।

গনক এতেক বলি করিল গমন।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ১৯ )

কোন ভাবেই সদাগরকে মনসা আর ঠেকাতে পারল না। সদাগর বাড়ি ফিরে পুত্র লখিন্দরের বিয়ে ঠিক করে বেহুলার সঙ্গে। মনসা সদাগরকে সহজভাবে পথে আনতে ব্যর্থ হলে একটু অন্য পথেই চলে। বেহুলা বিয়ের আগে একদিন স্নানের ঘাটে গিয়ে ছদ্মবেশি মনসার সঙ্গে বিবাদ করে। কেননা সদাগরের সঙ্গে মনসার যে বিবাদ তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বেহুলার সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়। বেহুলা মনে প্রানে মনসার ভক্ত একথা জানার পরেও স্নানের ঘাটে বেহুলার ছোট্ট একটি ভুলের জন্য মনসা অভিশাপ দিয়ে বলে 'বাসরে খাইবে পতি পাইবে মনস্তাপ।' (ক্ষে.ম. পৃ- ৩০ )

লখিন্দরের জন্মের পর বিধাতা ঘোষণা করেছিল বাসর ঘরে তার মৃত্যু হবে। একথা শুনে লখিন্দরের বিয়ের বাসর ঘর বানানো হয় সাঁতালি পর্বতে। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ঘরটি বানানো হয় যাতে তার মধ্যে কোন ছিদ্র না থাকে। কিন্তু মনসার ফন্দিরশ ফিকাছে বিশ্বকর্মাও হার মানে। দেব জগতের সকল দেবগণ মনসার রুষ্ট মূর্তির কথা জানে। বিশ্বকর্মা দ্বিতীয়বার গিয়ে আবার নিজের হাতে তৈরি করা বাসরের মধ্যে ছিদ্র করে আসে। সেই ছিদ্র পথে কালনাগ প্রবেশ করে লখিন্দরকে কাটে। বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে ছয়মাস জলে ভেসে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবসভায় নেচে স্বামীর প্রান ভিক্ষা প্রার্থনা করে। দেবসভায় মনসা হাজির হয়ে লখিন্দরের মৃত্যুর কারণ হিসাবে বলেছে-

না করে আমার পূজা চাঁদ সদাগরে।

সদাই দুর্বাক্য কহে প্রানে যত পারে।।

ছয়পুত্র খাইলাম ছয় বধূ রাঁড়ী।

কালিদহে করিলাম ছয় ডিঙ্গা বুঁড়ি।।

তবু নাহি মোর পূজা করে সদাগর।

অবশেষে খাইলাম পুত্র লখিন্দর।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৮৪ )

দেবগণের বহু অনুরোধে মনসা শেষ পর্যন্ত লখিন্দরকে নতুন করে প্রাণদান করে। সদাগর তার পূজা করবে এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েই মনসা তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং সদাগরের পুজাও লাভ করে। ক্ষমতা দখলের লড়াইতে স্বর্গে-মর্ত্যের সকলেই কম বেশি নিষ্ঠুর হয়। লড়াই করে দখল করতে পারলেই আবার রূপের পরিবর্তন হয়। মনসার ক্ষেত্রেও তাই হল। সদাগর মনসার পূজা করতে রাজি হলে মনসাও কিন্তু তাকে বৎস বলে সম্ভোধন করেছে। মনসার পূজা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনসার যে রূপের পরিচয় কবি ক্ষেমানন্দ দিয়েছেন তাতে করে মনসামঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে মনসা চরিত্রটি সত্যিই স্মরণীয় চরিত্র।

ক্ষেমানন্দ তাঁর এই কাব্যের মধ্যে যতগুলো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল বেহুলা। বেহুলার সতীত্ব ও পতিব্রতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে স্মরণীয় স্থান করে দিয়েছে। ক্ষেমানন্দের বেহুলা চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্বের জন্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ব্লেছেন-"বেহুলার দুঃখ বেদনা বর্ণনায় তিনি সার্থক করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও বহুলাংশে পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা মুক্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব তাহার উপর অত্যন্ত স্পষ্ট; এই দুইটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে আদর্শ ও রচনাগত শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই। (মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ- ২৮৮ ) এর থেকেই বোঝা যায় মনসা চরিত্র সৃষ্টিতে কতখানি শিল্পীস্নেহ ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

বেহুলা সায় বেনের কন্যা, বাস নিছনি নগর। পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন বেহুলা অত্যন্ত আদ্রের। বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে ঠিক হলে মনসার নজর পড়ে বেহুলার উপর। সায়বেনের ঘরে একমাত্র কন্যা বেহুলার সুখের অন্ত নেই। লখিন্দরকে বিয়ে করার পর থেকে বেহুলার জীবনে চলে আসে অশেষ দুঃখ বেদনা। সদাগর ও মনসার শত্রুতার মাঝখানে বেহুলা এসে প্রবেশ করে। বিয়ের আগে স্নানের ঘাটে মনসার অভিশাপ পাওয়াতে বিয়ের বাসর রাত্রি থেকেই বেহুলা সতর্ক। মনসার মন্ত্রণায় বঙ্করাজ, কালদন্ড ও উদয়নাগ বাসর ঘরে লখিন্দরকে কাটতে এলে চাচা, জ্যাঠা ও দাদা বলে সম্ভোধন করেছে। কিন্তু এর পরেও বেহুলা কালনাগের হাত থেকে নিজের স্বামীকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কালনাগিনী বাসর ঘরে প্রবেশ করলে লখিন্দরের পাশ ফিরতে গিয়ে তার মাথায় পা লাগে। এই দোষের কারনেই লখিন্দরের মৃত্যু হয়। এখান থেকেই শুরু হয় বেহুলার জীবনের অশেষ দুঃখ ও সতীত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। বেহুলা দুঃখ বেদনাকে প্রকাশ করতে কবি ক্ষেমানন্দ বলেছেন-

প্রাননাথ মরে লোহার বাসরে

বেহুলা নাচনী কান্দে।

বেশ ছারখার মুক্ত কেশ তার

দোসর নাহিক সাথে।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৩০ )

এখানে লেখক বেহুলার দুঃখের কথা করুণ ভাবে ব্যক্ত করলেও বেহুলা যখন মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে কান্না করছে তখন সেই দুঃখ যেন আরও বেশি মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। বেহুলা বলেছে-

মোর প্রাণনাথ লইল কোন জন

না জানি যাব কোন দেশে।।

শিরে হানি হাত উঠ প্রাণনাথ

ধরিতে না পারি হিয়া।

আমি অভাগিনী খণ্ডক কপালিনী

কোথা গেলে ফাঁকি দিয়া।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৩০ )

এই বয়সে একটি মেয়ে স্বামীর মৃত্যুতে কীই বা করতে পারে। কান্নাই একমাত্র সম্বল এই বয়সের মেয়েদের। বেহুলা কিন্তু এর ব্যতিক্রম। বিয়ের আগে লোহার কলাই যদি সিদ্ধ করে শ্বশুরকে খাওয়াতে পারে তাহলে মৃত স্বামীকে কেন বাঁচাতে পারবে না। লখিন্দরের মৃত্যুতে সনকার কাছ থেকে কটুবাক্য শোনার পর বেহুলার সংকল্প আরও মজবুত হয়ে উঠে। শ্বশুরকে অনুরোধ করে কলার মান্দাসের ব্যবস্থা করতে। গ্রামবাসীরা সকলেই অবাক হয়ে যায় বেহুলার কর্মকাণ্ডের কথা শুনে। যেহেতু নিজের সংকল্পে অটুট, তাই শেষ পর্যন্ত সকল বাঁধা কাটিয়ে মৃত স্বামীকে কলার মান্দাসে নিয়ে ভাসতে শুরু করে।

বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে যাত্রা করে নদীর জলে। শ্বশুর শাশুড়ির সমস্ত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। অল্প বয়সে স্বামী মারা গেলেও বিধবা হয়ে সে থাকতে চায়নি। তাই যাওয়ার আগে সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেছেন-

বিনয়ে প্রণতি করি সর্বলোক কাছে।

আশীর্বাদ কর মোরে কান্ত যেন বাঁচে।।

শুনিয়া সর্বলোক বিষাদিত মন।

চক্ষের জলেতে সবার তিতিল বসন।। (৫৫)

বেহুলা কলার মান্দাসে করে ভাসতে শুরু করলে মনসা শ্বেত কাকের রূপ ধরে বেহুলার কাছে আসে। বেহুলা তাকে অনুরোধ করে নিছনি নগরে বাবা মায়ের কাছে তার এই খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নিছনি নগরে এই খবর পৌছালেও বেহুলাকে তার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি কেউ। খবর পেয়ে বেহুলার তিন ভাই তাকে নিতে এলেও বেহুলার মন দুর্বল হয়নি। নদীর কিনারায় বসে ভাইয়েরা কাঁদতে শুরু করলে বেহুলা তাদের শান্তনা দিয়ে বলেছে-

দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কড়ে রাঁড়ী।

কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ি।।

কহিবে মায়রে মোরে আশিস করিতে।

পরিণামে পারি যদি কান্তে জিয়াইতে।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৬১ )

যেকোন মৃতদেহ জলে কয়েকদিন থাকার পর দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। লখিন্দরের শরীর থেকেও সেই গন্ধ বের হচ্ছিল। হাঙ্গর, কুমীর, জোঁক এই পচা গন্ধের জন্য মান্দাসের পাশে পাশে চলতে থাকে। আমদপুর পৌঁছানোর পর দেখা হয় গোদার সঙ্গে। বেহুলার রুপে মুগ্ধ হয়ে গোদা তাকে নানা ভাবে বিয়ে করার লোভ দেখায়। গোদার এই ব্যবহারে বেহুলা বিরক্ত হচ্ছে। কেননা যে নারী মৃত স্বামীকে নিয়ে নদীর জলে ভেসে বেড়াতে পারে সেই নারী কি গোদার বিয়ের প্রস্তাবকে ভালো চোখে দেখতে পারে। বিরক্ত হয়ে বেহুলা গোদাকে বলেছে-

যদি কর বিড়ম্বনা দেখ মোর সতীপনা

সাপে ভস্ম করিব যে তোরে।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৬৬ )

গোদার হাত থেকে রেহাই পেয়ে অনেক প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে শেষে নেতার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। ত্রিবেণীর এই ঘাটে সকল দেবতাদের কাপড় কাচা হয়। অপরিচিত স্থানে গিয়ে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয় সেই বিষয়েও বেহুলা পারদর্শী। বেহুলার নিজের আসল পরিচয় এবং কিভাবে এখানে আসা সবকিছু বলে নিজের আশ্রয় লাভের জন্য নেতাকে বলেছে-

তুমি গো পরমা দেবী তোমার চরণ সেবি

আজি হৈতে তুমি মোর মাসি।

দুঃখ না ভাবিও তুমি শিশুকাল হৈতে আমি

কাপড় কাচিতে ভালোবাসি।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৭৬ )

নেতার কাছে আশ্রয় পেয়ে বেহুলা তাকে বিশ্রাম দিয়ে নিজেই কাপড় কাচতে থাকে। দেবীর কৃপায় নেতার থেকে বেহুলার কাচা কাপড় অধিক উজ্জ্বল দেখাল। দেবতারা এই হঠাৎ এত পরিষ্কার কাপড় কোথা থেকে এল এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা বেহুলাকে নিজের বোনঝি বলে পরিচয় দেয়। এর ফলে বেহুলার দেবসভায় যাওয়ার পথ সহজ হয়। দেবসভায় তার ডাক পড়ে নাচার জন্য। সেখানে নাচ দেখিয়েছে। এখানে সবথেকে মর্মান্তিক বিষয় হল মৃত স্বামীর জন্য নিজের বুক ফাটে, অথচ হাসি হাসি মুখে নিজেকে নাচতে হল। দেবসভায় বেহুলার আসল পরিচয় জানতে চাইলে বেহুলা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে-

বিভা দিনে নাথেরে খাইল কাল সাপে।।

তখনি মরিল প্রভু কালিনীর বিষে।

জলে ভেসে আসি তাঁর জীবনের আশে।।

যতেক দেবতা যদি করহ কল্যাণ।

পুনরপি মোর পতি পায় প্রাণদান।। ( ক্ষে.ম. পৃ- ৮০ )

এই দেবসভায় বেহুলা মনসাকে সদাগর কর্তৃক পুজার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৃত স্বামীর প্রান বাঁচায়। এরপর বেহুলা জীবিত স্বামী ও নিজের সতীত্ব নিয়ে প্রথমে বাবার বাড়ি, তারপর আসে শ্বশুরবাড়ি। রামায়ণের সীতার মতই বেহুলা সতী সাবিত্রী ও পতিব্রতা। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, সীতা জীবিত স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যায় আর বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভাসে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও দৈব বিধানের বিরুদ্ধে বেহুলা বিদ্রোহিণী। প্রতি নিয়ত সে মনসার আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিয়ের প্রথম রাতে মধুময় স্বাদ গ্রহণের পূর্বেই তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আমরা সদাগরের ব্যক্তিত্ব, মনসার রুষ্টরূপ ও বেহুলার দুঃখ বেদনার সঙ্গে সতীত্ব ও পতিব্রতার পরিচয় পাই। ক্ষেমানন্দও এই কাব্যে বিশেষ কোন নতুনত্ব সংযোজন করতে পারেননি। তাছাড়া মধ্যযুগের সাহিত্যে এটা সম্ভব ছিল না। সকল কবিদের রচনাতে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনি একই ধাচের। এই একই কাহিনিকে নিয়ে লিখলেও ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলের একজন অন্যতম স্রষ্টার পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষেমানন্দের ভাষা যেমন সহজ সরল তেমনি তাঁর মনসা ও সদাগরের বিবাদও স্বাভাবিক হয়েছে। তবে বেহুলার বেলায় পাঠকের মনকে অধিক পরিমাণে আকর্ষিত করেছে। এত অল্প বয়সে একটি মেয়ে এতগুলো বিপদ কাটিয়ে উঠে মৃত স্বামীর প্রান বাঁচাতে পেরেছে শুধুমাত্র তার সরলতম কথার মাধ্যমে। বেহুলার মুখের ভাষাই পাঠকদের মোহিত করে দেয়। এইরূপ মৌলিকতার দাপটে ক্ষেমানন্দ তো বটেই, আরও অনেক স্রষ্টার অনেক সৃষ্টিই বাংলা সাহিত্যের আসরে চিরকালের আসন লাভ করে আছে।

গ্রন্থ সহায়কঃ

১/ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬১।

২/ ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃলি, (একাদশ সংস্করণ) ২০০৬।

৩/ মল্লিক, দীপঙ্কর, মধ্যযুগঃ ফিরে দেখা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

৪/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃলি, ১৯৬৬।

৫/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ, মধ্যযুগের সাহিত্যে গতানুগতিকতা বনাম মৌলিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০০৮।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য

টুম্পা ব্যাপারী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৮ সালে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের পর পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের বাস্তু সমস্যাকে নিয়ে তিনি নাটকটি রচনা করেন। পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের ফলে সেখানকার হিন্দুরা বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বার্থান্বেষী মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের সেখানে টিকে থাকা খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত হিন্দুরা সবকিছু জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় এসে নিজেদের বাঁচার পথ খুঁজছেন। দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষরা না পেরেছে জমিজমা বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় আসতে, না পেরেছে ক্ষমতালোভী মানুষদের সঙ্গে ঠিকভাবে থাকতে। আর এই দু’য়ের টানাপড়েন উঠে এসেছে ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে।

এই নাটকের মুখ্য চরিত্র মহেন্দ্র মাষ্টার। তিনি বিচক্ষণ মানুষ, পরিস্থিতি বুঝে মোকাবিলা করেন। শচীনের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার কথা শুনে মহেন্দ্র বলেছেন- ‘চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটা বেচে দেবে?’১ চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটা তার কাছে সোনার চেয়ে বেশি মূল্যবান। তাই বাস্তুভিটা বিক্রি করা তার কাছে অনেক বড়ো পাপের। শত অত্যচারেও তিনি নিরব থেকেছেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে তার বন্ধু। আমীন মুন্সীর ছেলে অসুস্থ হলে বর্ষা রাতে সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি ছুটে গিয়েছেন। কিন্তু যখন মুসলিম অত্যাচারের কথা গ্রামের মোড়ল সোনামোল্লাকে জানাতে গিয়েছেন তখন তিনি তার কোন প্রতিকার পান নি। একদিকে স্ত্রী-কন্যার নিরাপত্তা অন্যদিকে ভিটে-মাটির প্রতি মমত্বে তিনি ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। পাঠশালার টানও তিনি ছাড়তে পারেন না।

মাষ্টারের স্ত্রী মানদা দুঃখ প্রকাশ করলেও মহেন্দ্র মাষ্টার সব সময় আশার বাণী শুনিয়ে গেছেন। তার বক্তব্য- কিছু করার নেই। মান ইজ্জত রাখার জন্য একটু কষ্ট করতে হয়। চিরদিন এক রকম থাকে না।

মহেন্দ্র ।। কি করবে-মান ইজ্জত রাখবার জন্যে দিন কয়েক একটু কষ্ট করতে হবে।

মানদা ।। দিন কয়েক কেন- এখানে থাকলে হয়ত এভাবেই থাকতে হবে।

মহেন্দ্র ।। না গো না। চিরদিনই কি এরকম থাকবে।২

আমীন মুন্সী ছিলেন টাইপ চরিত্র। নন্দন গ্রামের মোক্তারের মাষ্টার। মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সে কারণে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। মহেন্দ্র মাষ্টারের প্রতি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা মহেন্দ্র মাষ্টারকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।

নাটকের প্রথম দিকে সোনামোল্লা হিন্দু বিরোধিতা না করলেও মুসলমানদের ঠেকাতে কোনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। মহেন্দ্র মাষ্টার তার সাত পুরুষের ভিটা-মাটি ছেড়ে যেতে রাজি নয়। কিন্তু চারপাশের পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে তিনিও বাস্তুভিটা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। নন্দন গ্রামের মোড়ল প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সোনামোল্লার ছেলেদের অত্যাচার, হিংস্র ইয়াসিন মিঞা ও তার দলবল লঞ্চ লুঠ করলে মহেন্দ্র মাষ্টার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তিনি নিজের মনকে বোঝাতে থাকেন আর ভিটেতে বাস করা যাবে না। এদিকে মাষ্টারের বাড়ি ছাড়ার কথা শুনে সোনামোল্লার শুভ বুদ্ধির সূচনা হয়। সে তার দলবল নিয়ে মাষ্টারের যাওয়ার পথে বাধা দান করে।

ইয়াসিন ধনী ও কুচক্রী। হিন্দুদের হাতে জামাইকে খুনের প্রতিহিংসায় হিন্দু নিধন যজ্ঞে তিনি মেতে ওঠেন। তারই নেতৃত্বে লঞ্চ লুঠ ও ধানের নৌকা লুঠ হয়েছে। নাট্যকার ইয়াসিনকে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল মন দিয়ে গড়েছেন। বিরোধী পক্ষ বলে তিনি কোন অবিচার করেন নি।

মহেন্দ্র মাষ্টারের স্ত্রী মানদা, মুসলমানদের অত্যাচারে পরিবারকে রক্ষা করার চিন্তায় ব্যাকুল। স্বামীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বারে বারে অনুরোধ করেছেন। মেয়ে কমলার জন্য তার উৎকণ্ঠার শেষ নাই। বাস্তুত্যাগের আগের মুহূর্তে তাকে বেদনায় বিহ্বল হতে দেখা গেছে। মানদা চরিত্রের মধ্যে কর্তৃত্বের ভূমিকা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়।

ড. অজিত কুমার ঘোষ, ‘বাস্তুভিটা’নাটক সম্পর্কে বলেছেন-‘কফিলদ্ধি ও আমীন মুন্সী মিলনের পথ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মুত্ততার সময় তাদের প্রভাব যে নগন্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করিবেন। বাস্তুভিটা ত্যাগ করা মর্মচ্ছেদের মতই ক্লেশকর। কিন্তু যে সব লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন তাহারা শুধু হুজুগ কিংবা মিথ্যা আতঙ্কে মাতিয়া আসিতেছেন না, নিরুদ্বেগ শান্তি লইয়া সমাজ গঠনের আশা নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই তাহারা চলিয়া আসিতেছেন’।৩ এ প্রসঙ্গে কলকাতা গণনাট্য সংঘের সভাপতি ও অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের উক্তি-‘হাজার বছর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান শান্তভাবে প্রতিবেশীরুপে ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে সহজ সামাজিক বন্ধন যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল আমরা যেন তাহা ভুলিতে চলিতেছি। অথচ সে কথা না ভোলার পথেই রহিয়াছে সহজ সমাধানের পথ। ‘বাস্তুভিটা’ একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সেই কথাই স্মরণ করাইতে চায়। আলোক বর্ত্তিকা ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেকখানি অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ।’৪

সমস্যাই শেষ কথা নয়। সমস্যার মধ্যেই থাকে সমাধানের পথ। নাটকের শেষে দেখি প্রত্যেকেই যেন সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন, মহেন্দ্র মাষ্টারকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার মধ্যে দিয়ে। নাটকের সমাপ্তি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্য দিয়ে।

শুধু সমালোচকগণ নন বাস্তুভিটা নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র জানাচ্ছেন-‘১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট রাত্রি বারোটার সময় ছুটে গেলাম মানিকতলা চৌমাথায়। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এল। সেদিন সাধারণ মানুষের মনে কি আনন্দের জোয়ার। মানিকতলায় লালবাগান অঞ্চলে যে সব মুসলমান দাঙ্গার সময় রাজাবাজারে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ছুটে এলে মানিকতলায়। হিন্দু, মুসলমান পরস্পরকে করল আলিঙ্গন। এই দৃশ্য একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকিত করল। ভাবলাম এটাই সত্য। রাজনৈতিক কারণে একটা দেশকে দু’ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু একটা জাতিকে দু’ভাগ করা যায় না। এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্যই এল আমার ‘বাস্তুভিটা’ নাটক।’৫ আবার অন্যত্র বাস্তুভিটা নাটক রচনার কারণ সম্পর্কে দিগিন্দ্রচন্দ্র জানাচ্ছেন-“আমার ‘তরঙ্গ’ নাটক পড়ে অত্যন্ত প্রীত হয়ে স্বর্গীয় কবি ও সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ‘বঙ্গদর্শন’- এর জন্য একটি নাটিকা লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতেই উৎসাহিত হয়ে আমি ‘বাস্তুভিটা’ রচনায় হাত দিই।”৬ বাস্তুভিটা নাটকে নাট্যকার সাত জনের মুখে কলকাতার নাগরিক সংলাপ বসিয়েছেন। বাকি চরিত্ররা পূর্ববঙ্গের হলেও, যারা শিক্ষিত তাদের মুখে মার্জিত সংলাপ বসিয়েছেন। যেমন- মহেন্দ্র মাষ্টার, তার স্ত্রী মানদা ইত্যাদি। আবার পূর্ববঙ্গের জেলে-চাষি-মাঝি এদের মুখে পূর্ববঙ্গের কথ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। অর্থ্যাৎ তিনি চরিত্র উপযোগী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। যা নাটকের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তুভিটা নাটকে বাস্তুভিটা শুধু মাত্র কোন ব্যক্তি মানুষের ভিটে-মাটিকে ইঙ্গিত করেনি, করেছে সমগ্র দেশকে। এখানে মহেন্দ্র মাষ্টার বাংলাদেশকে নিজের বাস্তুভিটা মনে করেছেন। সংসারকে তিনি ভালোবাসেন, সংসারের উন্নতির জন্য তিনি তৎপর। তবে তার জন্য তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। দেশের আস্থির পরিস্থিতি মানদাকে চিন্তিত করে তুললেও মহেন্দ্র মাষ্টার নিরব থেকে যান। তাঁর অন্তরের যন্ত্রণা পরিবারের নিরাপত্তার থেকেও অনেক বেশি দেশের জন্য। প্রতিবেশীরা মুসলিম হলেও তাদেরকে নিয়ে তিনি একত্রে থাকতে চেয়েছেন। ধর্মগত কারণে মানুষের মধ্যে কখনও ভেদাভেদ থাকতে পারে না এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তিনি। তাই নাটকে জাতিগত ঐক্যের কথা মহেন্দ্র মাষ্টারের সংলাপে একাধিক বার প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যসূত্র-

১। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বাস্তুভিটা, কলকাতা, পুস্তকালয়, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-১০।

২। ঐ, পৃষ্ঠা-৩।

৩। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে’জ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৮৭

৪। পূর্বোক্ত (সূত্র-১, ভূমিকা অংশ)

৫। পূর্বোক্ত (সূত্র-১, ভূমিকা অংশ)

৬। পূর্বোক্ত (সূত্র-১, পৃষ্ঠা-২)

ঘটি-বাঙাল সমস্যা ও সমরেশ মজুমদারের কয়েকটি উপন্যাস

সঞ্জীবন মণ্ডল গবেষক ছাত্র ,বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটি-বাঙাল নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের এই সমস্যার উদ্ভব,প্রেক্ষাপট,বিস্তার ও দ্বন্ধ জটিলতা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। অবিভক্ত বাংলার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুটি বিভাগ নিয়েই ভারতের শস্যশ্যামলা বঙ্গ ছিল। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্যের সুবিধার্থে বঙ্গবিভাজনে উদ্যোগী হলে দুই বাংলারই আপামর জনসাধারণ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বাংলাকে অখণ্ড রাখতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট এ দেখা যায় দুই বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাষে পার্থক্য থাকলেও বাঙ্গালি কিন্তু ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধকে প্রশ্রয় না দিয়ে অখণ্ড বাংলার প্রতিই তাদের মায়া মমতা ও ভালোবাসাকে উজার করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাঙ্গালির ভাবাবেগকে অখণ্ড বাংলার প্রতি উদ্দীপ্ত করার জন্য লিখেছিলেন-‘বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল/পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূণ্য হউক হে ভগবান’।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ থেকেই আমরা ‘বাঙাল’ শব্দটির সাথে পরিচিতি লাভ করলেও ‘ঘটি’ শব্দটি কিন্তু মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায়না। তবে ‘ঘটি’ শব্দটি যে পশ্চিমবাংলার লোকেদের বোঝাত তার প্রমাণ আমরা পাই একটি প্রবাদে-‘তাল পুকুরে ঘটি ডুবে না’ অর্থাৎ শস্য শ্যামলা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গ যে পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে ছিল তারই ব্যঙ্গার্থ বহন করে উক্ত প্রবাদটি এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শুস্করুক্ষ জলবায়ুর কথাও আমরা প্রবাদটিতে পাই। ‘বাঙাল’ শব্দটির সঙ্গে আমরা চন্ডীমঙ্গল,চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেছি। উক্ত সাহিত্যে ‘বাঙাল’ শব্দটি মুলত ব্যবহৃত হয়েছে ঠক,বোকা,চতুর,নিঃস্ব প্রভৃতি প্রতিশব্দ হিসেবে। আবার ‘ঘটি’ শব্দটির প্রচলন হয়েছে অনেক পরে এবং শব্দটি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তি সময়কালে। ‘ঘটি’ শব্দটির অর্থ জলপাত্র; এর প্রতিশব্দ লোটার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কথিত আছে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা একসময় দূরদূরান্তে যাওয়ার সময় রাস্তায় জলকষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাঠির মাথায় একটি জলভর্তি ঘটি ঝুলিয়ে নিতেন এবং এই ঘটি বা লোটার সাহায্যে রাস্তার পাশে থাকা জলাশয় থেকে জল তুলে প্রয়োজনীয় কাজ করতেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের লোক পূর্ববঙ্গের লোকের কাছে ‘ঘটি’ হিসেবে পরিগণিত হতেন। এই মতবাদের যুক্তি হিসেবে আমরা বলতে পারি পূর্ববঙ্গ মূলত নদীমাতৃক এলাকা, তাই জল সহজলভ্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ শুষ্ক ও খরা প্রবণ এলাকা হওয়ায় জলের একটা অভাব ছিলই বা বর্তমানেও আছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,মেদিনীপুর,বীরভূম প্রভৃতি জেলা গুলিতে আজও জলের সংকট বর্তমান। আবার পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের ভূমিপূত্ররা নিজেদের ক্ষত্রিয় বা রাজবংশী হিসেবে তুলে ধরলেও অধুনা উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী ঘটি ও বাঙালদের কাছে তাঁদের পরিচয় দেশীয় বা এতদ্বেশীয় হিসেবে। রংপুর থেকে যাঁরা পশিমবঙ্গে এসেছেন তাঁরাও কামরূপী উপভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তাঁদেরও প্রাথমিক পরিচয় ক্ষত্রিয় বা রাজবংশী। অর্থাৎ অবিভিক্ত বাংলার কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষার জনগোষ্ঠীর জনগণ কিন্তু ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধের মধ্যে আসেনি। এমনকি পূর্ববঙ্গের নিন্মবর্ণের লোকেরা উত্তরবঙ্গের ভূমি পূত্রদের কাছে ঢাকাইয়া,ভাটিয়া বা দক্ষিণদেশী হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রেও কিন্তু ঘটি-বাঙ্গাল দ্বন্ধ আসেনি। ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধ এসেছে মূলত বঙ্গালী উপভাষার সঙ্গে রাঢ়ী,ঝারখন্ডী,বরেন্দ্রী উপভাষাভাষী জনগোষ্ঠির। অপরদিকে যশোর ও খুলনার লোকেরা নিজেদের ঘটি বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন,কেননা এই দুটি অঞ্চলের সাথে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষা,রীতি নীতি খাদ্যাভাসের অনেকটাই মিল রয়েছে। কিন্তু যশোর-খুলনার সাথে আমরা বাঁকুড়া,পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষার মিল খুঁজে পাইনা,এমনকি কলকাতা নদীয়ার ভাষার সাথে রাঢ়বঙ্গের মৌখিক ভাষারও বিপুল পার্থক্য রয়েছে। শুধু তাই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই এলাকা,গোত্র,গোষ্ঠী,সম্প্রদায় ভেদে রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠানেরও পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আমরা সামগ্রীক ভাবে বলতে পারি শুধুমাত্র এলাকা গত দিক দিয়ে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ভেদে ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়,বরং দুই বাংলার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এককথায় বাংলা ভাষাভাষীরা সকলেই বাঙ্গালী সে তাদের মৌখিক উচ্চারণ যে বঙ্গউপভাষাই হোকনা কেন।

যাইহোক, ঘটি-বাঙাল সমস্যা প্রকট হতে থাকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। তারপর ’৪৭ এর দেশভাগ ও ’৭১ এর সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এই সমস্যাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। কেননা এই সময়কালে পূর্ববঙ্গের মানুষ মাত্রই রাঢ়বঙ্গ,কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে বাঙাল অর্থাৎ নির্বোধ,চালাক,নতুবা ছোট মানসিকতার জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হত,যেখানে সমগোত্র বা গোষ্ঠীকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের ভূমিপূত্রদের কাছে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীরা ‘বাঙাল’ হিসেবে পরিগণিত হয়নি; রংপুর বাদে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জনগোষ্ঠীই তাঁদের কাছে ঢাকাইয়া,ভাটিয়া বা দক্ষিণদেশী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং প্রায় সমভাষী রংপুর জেলার লোকেরা কুচবিহার,জলপাইগুড়ি ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ‘রংপুরিয়া’ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- বঙ্গালী উপভাষাভাষী লোকেদের রাঢ়ী ঝাড়খন্ডী,বরেন্দ্রী ভাষাভাষী লোকেরা যেমন সহজে মেনে নিতে পারেনি,তেমনি উত্তরবঙ্গের কামরূপী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীও কিন্তু রংপুরের অধিবাসীদের সহজেই মেনে নেননি;মৌখিক ভাষা,রীতি নীতি ও সংস্কৃতির মিল থাকলেও। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গ যেহেতু কৃষিপ্রধান ও জলপ্রধান এলাকা তাই সেখানকার অধিবাসীরাও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও জলপ্রধান এলাকা গুলিতেই নিজদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবশ্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলি উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চল সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেছেন। কিন্তু আসাম,আন্দামান,মরিচঝাঁপি,দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু বাঙ্গালির বসবাসের ইতিহাস আলাদা ব্যাপার।

জন্ম সূত্রে সমরেশ মজুমদার নদীয়া জেলার খাঁটি ঘটি পরিবারের সন্তান হলেও পিতার কর্মসূত্রে জলপাইগুড়ি জেলার এমন একটি জায়গায় তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে যেখানে মূলত আদিবাসী ও রাজবংশী সম্প্রদায়েরই বসবাস। চা বাগানে কাজের জন্য ইংরেজরা হাজারিবাগ,রাঁচি,সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসী,মদেশীয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে এসেছিলেন ডুয়ার্সে। তাই আজও উক্ত অঞ্চল গুলির সাথে ডুয়ার্সের এই উপজাতি সম্প্রদায় গুলির দৈহিক,সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও ভাষার মিল রয়েছে;থাকাটাও স্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গ যেহেতু রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা তাই ডুয়ার্সেও এঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। অর্থাৎ সমরেশবাবুর পূর্বপুরুষ ঘটি প্রধান্ এলাকার হলেও তিনি কিন্তু বড় হয়েছেন রাজবংশী,আদিবাসী ও মদেশীয়া অধ্যুষিত এলাকায়। সেদিক থেকে আমরা দেখতে পাই সমরেশ বাবুর জন্মের আগে থেকেই ডুয়ার্সের সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতির দিকে এগোচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ তাঁর শৈশবেই দেশভাগ হয়েছে এবং ’৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পূর্ণযুবক। তাই তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের খুব কাছে থেকেই দেখেছেন। সমরেশবাবু জলপাইগুড়ি ও কলকাতায় জন্ম ও কর্ম সূত্রে আজও বর্তমান,তাই তাঁর লেখায় আমরা উত্তরবঙ্গ,কলকাতা ও তার সন্নিহিত পরিবেশকে যেমনভাবে পাই রাঢ়বঙ্গ অর্থাৎ বাঁকুড়া,পুরুলিয়া বীরভূমের কথা তেমনভাবে পাইনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমগ্র উত্তরবঙ্গ,কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা দেশান্তরী হয়ে বসতি গড়ে তুললেও রাঢ়বঙ্গে কিন্তু তাদের প্রভাব তেমন নেই। সমরেশ বাবুও তাই এই উদ্বাস্তু,শরণার্থীদের জন্ম থেকেই দেখে আসছেন বলেই তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে এই চরিত্ররাও ভিড় করেছে।

‘কালবেলা’ উপন্যাসের নায়ক অনিমেষ মিত্র জলপাইগুড়ির ছেলে। তাই আমাদের মনে হতে পারে তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-? রাজবংশী,আদিবাসী,মদেশীয়া,বাঙাল না ঘটি? কেননা ‘কালবেলা’র যে সময়কাল-সেই সময়কালে জলপাইগুড়ি শহর ও গ্রাম গুলোতে রাজবংশীদের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের বাঙালরাও সংখ্যার দিক থেকে প্রায় সমান হয়ে উঠেছিলেন। অনিমেষ মিত্রের জন্ম স্বর্গছেঁড়া চা বাগানে;চা বাগান গুলোতে তো বিভিন্ন উপজাতিদেরই বসবাস ; কলকাতা ও রাঢ়বঙ্গের অধিবাসীরা তো চা বাগান গুলোতে সংখ্যায় খুবই কম। পদবী গত দিক থেকে বিচার করে অনিমেষবাবু কে আমরা ঘটি ও বাঙালের যে কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরতে পারি,কেননা মিত্র পদবী রাজবংশী ও উপজাতি সম্প্রদায় গুলির মধ্যে নেই। এই পদবীটি মূলত রয়েছে অবিভক্ত বাংলার কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঔপন্যাসিক নিজে ঘটি কিন্তু বাঙাল ও রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় বেড়ে উঠে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে তিনি কোন পর্যায়ে ফেলেছেন? উপন্যাসটি পাঠ করে আমরা দেখতে পাই লেখকের নিজের জীবনের অনেকটাই ছায়া এই চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাই অনিমেষ ঘটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। পরবর্তি সময়ে অনিমেষকে আমরা পেয়েছিও তাই। ঘটি বাঙাল প্রভেদ করতে গিয়ে তিনি উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন-*‘শ্যামবাজার থেকে বউ বাজারকে বলা হয় ঘটি এলাকা’* কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই *‘পূর্ববঙ্গের ধনবান শিক্ষিত মানুষেরা এসে দেশের উপরতলার চেয়ার গুলো দখল করে নিজেদের আলাদা গোত্র বলে চিহ্নিত করে নিলেন। …….কিন্তু স্বাধীনতার পর কলকাতা অন্য রকম চেহারা নিয়ে নিল………বেলঘরিয়া দমদম এলাকার সঙ্গে টালিগঞ্জ যাদবপুর গড়িয়ার মানুষদের চরিত্রগত মিল বেশী,কারণ এই সব এলাকার মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে এসে কলোনী স্থাপন করেছিলেন। দেশ ত্যাগের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা এঁদের জীবন যাত্রার ধরন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের থেকে অনেক ধারালো করে দিয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জেদী হওয়ায় ক্রমশ এঁরা কলকাতার উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করে নিয়েছেন’।*

‘কালবেলা’ উপন্যাসেই আমরা দেখি ছাত্রাবস্থায় অনিমেষ মিত্র অভাব অনটনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু পরমহংসের সাথে টিউশনি পড়ানোর বুদ্ধিপরামর্শ করলে পরমহংস তাঁকে ছাত্রী জোগার করে দিয়েছেন এবং এও জানিয়েছেন*-‘একদম উত্তর কলকাতার খাঁটি ঘটিদের বাড়ি।………এইসব ঘটি মেয়ে গুলো এক একটা কাঁকড়া বিছে।’* পরমহংসের দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে পড়ানোর জন্য অনিমেষ শোভাবাজার চিৎপুর অঞ্চলের খাস ঘটি পাড়ায় গেলে ছাত্রীর পিতার সঙ্গে কথোপকথনে বাঙালদের প্রতি ঘটিদের বিদ্বেষকে সুনিপুণ ভাবে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। আমরা দেখি প্রথম দিনেই ছাত্রীর অভিভাবকের কাছে গৃহশিক্ষক অনিমেষবাবুকে নিজের পদবী,বংশ,গোত্র সমেত পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিতে হয়েছে। পিতৃবাড়ি জলপাইগুড়ি শুনে ভদ্রলোক পরম বিস্ময়ে জানতে চেয়েছেন-‘*জলপাইগুড়ি! ওখানে- মানে,তোমরা কি বাঙাল? না না বাঙাল মাষ্টার আমরা রাখবনা।’* পরমহংস পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রীক চিত্রকে তার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলে ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে প্রতুত্ত্যর দিয়েছেন*-‘আমাকে শেখাতে এসো না তুমি। রাজশাহী,রংপুর,জলপাইগুড়ি সব এক গোত্রের।আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় চালচলনের সাথে কোন মিল নেই। ভাতের থালা খাটের উপর তুলে খায় সব’।* আমরা জানি অনিমেষ মিত্রের পূর্বপুরুষ নদীয়া জেলা থেকে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলেন চা বাগানের কর্মসুত্রে,অর্থাৎ অনিমেষবাবু বাঙাল পরিবারের সন্তান নন,খাঁটি ঘটি পরিবারের সন্তান শুনে বাড়ির মালিক তাঁকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে রাজি হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতে পারি যে দেশভাগের পরে ঘটি-বাঙাল সমস্যা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চলে একটা সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। উভয় বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন ছিল অলীককল্পনা।এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠান গুলিতেও তাঁরা একে অপরকে মেনে নিতে পারেননি। রান্না,খাদ্যাভ্যাস,সংস্কৃতি,কথাবার্তা,প্রভৃতি বিষয়ে ফারাক আগে থেকেই ছিল। অবস্থাপন্ন এবং স্বল্পশিক্ষিত ঘটিরা মনে করতেন বাঙালরা কলকাতায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে; তাই বাঙালদের প্রায় জোড় করেই তাঁরা সামাজিক বয়কট করতেন। ঘটিদের এই গোঁড়ামির জন্যই তারা হয়তো দ্রুত পিছিয়ে পড়তে থাকেন বাঙালদের তুলনায়,যে কথা ঔপন্যাসিক স্বীকার করেছেন। তাই আমরা এই উপন্যাসেই দেখেছি অনিমেষবাবু নিজে ঘটি হয়েও উত্তর কলকাতার ঘটি পরিবারটির ছাত্রীকে পড়াতে পারেনি। কেননা প্রথম দিনই ভদ্রলোক অনিমেষকে বাইরের ঘরে অচ্ছুতের মত বসিয়ে জানতে চেয়েছেন*-‘জলখাবার সহ পড়ালে পনেরো টাকা পাবে,বাদ দিলে কুড়ি’।* অনিমেষ বাবুও প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করে টিউশনিকে বিদায় জানিয়ে বলেছে-‘*এরকম চশমখোর ব্যবসাদারের সঙ্গে আমার যে বনবে না তা বুঝতে পেরেছি’।*

‘কালপুরুষ’ উপন্যাসের অধিকাংশ প্রধান চরিত্রই ‘কালবেলা’ উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র অর্ক; মাধবীলতা ও অনিমেষ মিত্রের এক মাত্র সন্তান।অর্ক উত্তরবঙ্গের কোন মফঃস্বলে জন্মগ্রহণ করেনি; অর্কর জন্ম হয়েছে কলকাতার বস্তি অঞ্চলে। বেলঘরিয়ার তিন নম্বর ইশ্বরপুকুর লেনেই সে জন্ম থেকে বড় হয়েছে। তাই তার বেশীরভাগ বন্ধুবান্ধবও বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের এবং এই পরিবারগুলি ঘটি ও বাঙাল নির্বিশষে পাশাপাশিই অবস্থান করেছেন। ইশ্বরপুকুর লেন যেহেতু গরীরদের বস্তি তাই সেখানে কে ঘটি কে বাঙাল এই নিয়ে কারো মাথাব্যথা আমরা লক্ষ্য করতে পারিনা। এখানে উদ্বাস্ত নিয়ে সামান্য কথা বার্তা হলেও সকলেই ছুটছে নিজেদের পেটের তাগিদে। অর্থাৎ সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি স্বচ্ছল পরিবার গুলোতে ঘটি বাঙাল ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও নিঃস্ব দরিদ্র পরিবার গুলো কিন্তু কোন বাছবিচার করেনি। তাই অর্কর বন্ধু কোয়া নিজেকে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান ভাবলেও ঘটি বাঙালের প্রভেদকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিলু নামের সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকারও অর্কর কাছে নির্দ্ধিয়ায় জানায়-‘আমার সব বড়লোক আত্মীয় পাকিস্তানে,অ্যাদ্দিনে হয়তো তারা মিয়া সাহেব হয়ে গিয়েছে’। মাধবীলতা শ্বশুর মশায়ের অসুস্থতার খবর শুনে পূত্র ও অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার সময় শিলিগুড়ি পার হয়েই *কথা প্রসঙ্গে ঠাট্টার সুরে বলেছেন-‘বাটিরা ভাল মানুষ হয় মনে হচ্ছে............নর্থবেঙ্গলের লোক বাঙাল আর ঘটি মিশিয়ে’।* অর্থৎ উপন্যাসের কালসীমা অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে ঘটি-বাঙাল প্রভেদ মুছে নতুন শ্রেণী বাটির উদ্ভব হয়েছে সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়েই। শুধু তাই নয় ভিন্ন ভাষভাষী ও সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের গোঁড়ামিতেই আবদ্ধ থাকেনি; যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে।

মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘সাতকাহন’ দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের প্রেক্ষাপট ডুয়ার্সের স্বর্গছেঁড়া চা বাগান ও জলপাইগুড়ি শহর। তাই উপন্যাসে ঘটি-বাঙাল সমস্যা এসেছে। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি সমরেশ মজুমদার জলপাইগুড়ি হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন;তাঁর বিশিষ্ঠ উপন্যাস গুলিতেও উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে ব্যাপক ভাবে তুলে ধরেছেন এবং উপন্যাস গুলিতে কোননা কোন ভাবে লেখকের নিজের জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। তাই ‘সাতকাহন’ উপন্যাসে আমরা দেখি অমরনাথ *‘ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মামার এক বন্ধুর কাঠের ব্যবসায় চাকরি নিয়ে গেদে থেকে তিনি এসেছিলেন উত্তর বাংলায়’।* চা বাগানে চাকরী সূত্রে তিনি ভিন্নভাষাভাষী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেলা মেশা করলেও নিজের জাত্যাভিমানকে ভুলে থাকতে পারেননি। তাই মিশ্র সংস্কৃতিতে দীর্ঘ দিন থেকেও তিনি বান মাছ দেখেই চোখ ঘুরিয়ে নেন এবং*-‘কবে বান মাছ খেয়েছেন মনে করতে পারলেন না অমরনাথ’।* অমরনাথবাবুকে খুব নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ব্যক্তি সমরেশ বাবুর কোন নিকট অভিভাবককে আমরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পাব। যাইহোক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দীপার মধ্যে আমরা ঘটি বাঙালের কোন প্রভেদ পাইনা,কেননা দীপা যে সময়ের প্রতিনিধি সেই সময় উত্তরবঙ্গে শুধুমাত্র রাজবংশীদের একচ্ছত্র আধিপত্য কেড়ে নিয়েছে অন্যান্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাই ছোট্ট দীপা বা দীপাবলী তাঁর বন্ধুদের জাতপাত বাছবিচার না করে সকলকেই আপন করে নিয়েছে,কিন্তু বাড়িতে ঠাকুরমা মা বাবা প্রভৃতি অভিভাবকগণের মধ্যে বাঙালদের প্রতি হেয় মনোভাব রয়েছে তা সে বুঝতে পারত। তাই বিশু-খোকনের সাথে মাছ ধরা কেন্দ্রীক আলোচনায় দীপা জানিয়েছে *‘বান মাছ মা রাঁধবে না’*। কিন্তু বিশু উত্তর দিয়েছে*-‘আমার মা রাঁধবে। তোরা ঘটি তাই ভাল জিনিস খাসনা’।* ছোট্ট দীপা বিশুর কথা কিন্তু সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি-তাই তার মনে হয়েছে *‘আবার ঘটি বলে ঠোকা হল। ঠাকুমা বলে বাঙালদের কোনও বাছবিচার নেই’।* অর্থাৎ ঘটি বাঙাল সমস্যা বাইরে অনেকটা স্বাভাবিক হলেও অভ্যন্তরে কিন্তু ছিলই।

এই উপন্যাসে সত্যসাধন মাষ্টার মশাই চরিত্রটি কিন্তু সর্বক্ষণ বঙ্গালী উপভাষাতেই কথা বলেছেন। দীপার বাল্যবিবাহও সুসম্পন্ন হয়েছিল ঘটি আচার রীতিনীতি মেনেই। সেদিক থেকেও আমরা বলতে পারি দীপার শ্বশুর বাড়ির লোকজনও ছিল ঘটি সম্প্রদায়েরই এবং সমরেশ বাবু সুপরিকল্পিত ভাবেই দুটি ঘটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন,কারণ তৎকালীন সময়ে সামাজিক ভাবে ঘটি পরিবারের কন্যার সাথে বাঙাল পরিবারের পূত্রের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ অসম্ভব ব্যাপার ছিল । কিন্তু বাসর রাত্রের পরের দিনই দীপা বিধবা হলে তার শ্বশুর প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় দীপাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিজের ছোট মানসিকতাকেই তুলে ধরেছেন। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের সর্বশান্তদের প্রতিনিধি হয়েও সত্য সাধনবাবু দীপার বিয়ের আগেই আক্ষেপ করেছিলেন-‘*অন্যায়,ঘোরতর অন্যায়। সেই কবে বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেছিলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ হয় যাতে তার লাইগ্যা। কী লাভ হইল। আপনার মত শিক্ষিত মানুষ যদি না বোঝেন,ঘোরতর অন্যায়’।* ঘটি পরিবারের কঠোর শাসনে বাল্যবিধবা দীপাকেও কিন্তু কঠোর অনুশানের মধ্যেই চলতে হয়েছে। তাই নিজের অনিচ্ছা সত্বেও ঠাকুরমার অনুশাসনে তাকে দীর্ঘ দিন নিরামীষ খেতে হয়েছে।

‘সাতকাহন’ উপন্যাসে সমরেশবাবু বলেছেন-‘যেহেতু পূর্ববাংলার জেলা ভিত্তিক ভাষার চেহারা আলাদা,চট্টগ্রামের মানুষের সঙ্গে যশোরের মানুষ একই গলায় কথা বলতে পারে না,তাই এখানে এসে একটি সংকর ভাষা তৈরী হল। ডুয়ার্সে যে সব মানুষ এসেছিলেন তাঁদের বাড়ি ছিল রংপুর রাজশাহী ইত্যাদি জেলায়। ঢাকার কিছু মানুষও দিগভ্রান্ত হয়ে এদিকে চলে এসেছিলেন।.........তাঁদের পরিবারের মহিলারাও পূর্ববঙ্গ থেকে বয়ে আনা সংস্কার এবং ধর্মান্ধতা আঁকড়ে ছিলেন। মেয়েদের বিয়ের আগে বা পরে চা বাগানের রাস্তায়,বা গঞ্জের পথে দেখা যেতনা। অন্তত যৌবন এলে তো নয়ই’। ডুয়ার্সের স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের প্রবীণ নাগরিক,ঘটি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়েও তেজেন্দ্রবাবু সারাজীবন নীচ মানসিকাতার পরিচয়ই বহন করে গেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও বাল্য বিধবা দীপার প্রতি তাঁর কামমনোভাবকে আমরা যেমন লক্ষ্য করতে পারি তেমনি তাঁর বাঙাল বিদ্বেষ কথা বার্তা সাম্প্রদায়ীকতাকেই উস্কে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট*-‘বাঙালরা এসেই তো দেশের সর্বনাশ করেছে’।* তাই তিনি মাইকেল মধূসুদন দত্তের গ্রামের নাম শুনেই বিদ্বেষে বলে উঠেছেন*-‘সারাজীবন নকল ইংরেজ সেজে একটার পর একটা মেম বিয়ে করে যাওয়া খুব কৃতিত্বের কথা ? চার লাইন কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় ?......কবি হলেন কুমুদ রঞ্জন মল্লিক......বর্ধমানের মানুষ’।* আমরা জানি কবি সাহিত্যিকদের কোন জাত হয়না,তাঁরা সর্ব জাতের প্রতিনিধি,সমাজের সব কিছুকে তুলে ধরে,সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের কাজ। কিন্তু তেজেন্দ্রবাবুর মতো ব্যক্তির কাছে, নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির হয়ে শুধুমাত্র নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে মধূসুদন দত্তের মত কবির কবিত্বকে অস্বীকার করা মানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিতকেই অস্বীকার করা। এখান থেকেই বোঝা যায় একটা সময় ঘটি-বাঙাল বিদ্বেষ সমাজের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল।

এই উপন্যাসে আমরা রমলা সেন নামক আধুনিক মনস্কা একজন অধ্যাপিকাকে পাই যিনি ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সময়োপযোগী জীবন যাত্রায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অধ্যাপিকা সুলভ মনোভাবকে তুলে ধরেছেন। অমরনাথবাবু ও তার পরিবারের সাথে আকস্মিক ভাবে পরিচিত হয়েই দীপাবলীকে জীবনে সাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই দীপাবলী বাল্য বিধবা হলেও; বলা যেতে পারে নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়,সত্যসাধন মাষ্টারের সহযোগীতায় এবং রমলা সেনের অনুপ্রেরণাতেই সে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পাশ করে জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছে; সেযুগের আবহে যা কল্পনাতীত। রমলা সেন নিজেকে ব্রাম্মধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে যুক্তিগ্রাহ্য মনোভাব নিয়ে দীপাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাই আমরা দেখি দীপাবলী শিলিগুড়িতে রমলা সেনের বাড়ি ঘুরতে গেলে তাদের মধ্যে ঘটি-বাঙালের বিদ্বেষ নিয়ে কোন কথা হয়নি;বরং এলাকাগত ভাবে মানুষের বৈচিত্র্যতাকেই তাঁরা সমর্থন করেছেন। কিন্তু রমলা সেনের অধ্যাপক বন্ধুর মধ্যে ঘটি-বাঙাল বিদ্বেষ ব্যাপার আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। তিন জন একত্রে খেতে বসে তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়ে ছিল সেখানে পাঠকবর্গ দেখতে পান খাবার সময় দীপা তরকারি সম্বন্ধে জানতে চাইলে রমলা সেন জানিয়েছেন*-‘পোস্ত ঝিঙে চিংড়ি দিয়ে। তোমরা পোস্ত খাওনা’।* *‘বাড়িতে হয়না’*-দীপাবলীর উত্তর শুনে রমলা সেনের বন্ধু বর্ধমান নিবাসী সুধাময়বাবু অবাক হয়ে বলেছেন*-‘এই রকম ডিলিশিয়াশ তরকারি তোমরা খাওনা’।* রমলা সেন কিন্তু অবাক হননি-তিনি বাস্তব কথাই শুনিয়েছেন অধ্যাপক বন্ধুকে*-‘পোস্তটা দক্ষিণ বাংলায় চালু বেশী। উত্তর বাংলায় এখনও চালু হয়নি’।* কিন্তু সুধাময়বাবু উত্তর দিয়েছেন*-‘অদ্ভুত তো’।* এই কথার যুক্তি হিসেবে রমলা সেন জানিয়েছেন*-‘অঞ্চল ভিত্তিক খাবার খাওয়ার অভ্যেস তো হবেই। পূর্ব বাংলায় শুটকির চল খুব বেশী কিন্তু দক্ষিণ বাংলায় লোকে বমি করবে’।* এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি রমলা সেন জীবনে প্রায় সমগ্র বাংলা পরিভ্রমন করে বাংলার বৈচিত্র্য ও প্রকৃতিকে দুচোখ ভরে উপভোগ করেছেন এবং নিজেকে মানিয়েও নিয়েছেন-তাই তাঁর মধ্যে কোন ধর্ম বিদ্বেষী,জাতি ও সম্প্রদায় বিদ্বেষীতা প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু সুধাময়বাবু,তেজেন্দ্রবাবুরা জীবনে নিজেদের গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন; তাই গন্ডীর বাইরের সংস্কৃতিকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার এত বছর পরে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জাতি বিদ্বেষ অনেকটা মুছে গেলেও তার প্রভাব কিন্তু এখনো কমবেশী বর্তমান। তাই উপন্যাসিক ‘পরাণের পদ্মবনে’ নামক তাঁর স্মৃতি কথায় শুনিয়েছেন হিন্দু ও মুসলিম যে যে ধর্মাবলম্বীই হোকনা কেন বাংলা যদি তাদের মাতৃ ভাষা হয় তবে সে অবশ্যই বাঙ্গালি। কিন্তু অনেক হিন্দু বাঙ্গালিরা শুধু নিজেদেরই বাঙ্গালি ভাবেন;মুসলিমদের নয়। তাই তিনি উক্ত গ্রন্থে মা ও মেয়ের যে বাস্তবিক কথোপকথন উল্লেখ করেছেন তা তুলে ধরা যেতে পারে-

*‘আচ্ছা মা বাংলাদেশে যারা থাকে তারা কারা?*

*মা বললেন-‘মুসলমান’।*

*‘ও। আমরা বাঙালি আর ওরা মুসলমান,না?’*

*‘মা মাথা নাড়লেন ‘হ্যাঁ বোঝাতে’।*

সমরেশবাবু লক্ষ্য করেছেন মা ছোট্ট মেয়ের ভুল শুধরে না দিয়ে; মেয়ের কথাতেই সায় দিয়েছেন। স্বভাবত কারণেই মুসলমান সম্প্রদায়কে সেই মেয়েটি কখনই বাঙ্গালি ভাবতে পারবে না। যেমনটি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ,দেশভাগ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশান্তরী হবার পর। ওপার বাংলার হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় আসার পর থেকেই ঘটি বাঙাল ব্যাপারটি মাথা চাড়া দিয়ে এক বঙ্গের প্রতি অপর বঙ্গের মানুষ বিদ্বেষ রূপ ধারন করেছিলেন। ছোটরা পরিবারের বড়দের কাছেই এই বিদ্বেষের প্রাথমিক পাঠ আয়ত্ত্ব করে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় কে হেয় করার চেষ্টা করেছে। এলাকা,পরিবেশ,জলবায়ূ ভেদে মানুষের কন্ঠস্বর যেমন পরিবর্তন হয়,তেমনি তাদের খাদ্যাভ্যাস,সংস্কৃতি রীতি-নীতির পার্থক্যও স্বাভাবিক। তাই বলে এই পার্থক্যকে কখনই উপহাস করা উচিত নয়। ঈষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের একটা প্রতিযোগী মনোভাব কাজ করলেও উভয় বঙ্গের বাঙ্গালিরাই কিন্তু উভয় বঙ্গে কর্ম,আত্মীয়তা প্রভৃতি সূত্রে যাতায়াত ছিল,তখন ঘটি-বাঙাল প্রাধান্য ছিলনা বলেই আমরা জানি। মূলত ঘটি-বাঙাল প্রাধান্য পেয়েছে দেশ ভাগের ফলেই। স্বাধীনতার এত বছর পরে দুই বঙ্গের বাঙ্গালিদের মধ্যে মেলামেশা,আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন অনেকটা সহজ ব্যাপার হলেও রক্ষণশীল,স্বল্পশিক্ষিত বা নিজ গন্ডী ও ধ্যান ধারণায় আবদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালির মন থেকেই কিন্তু ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধ মুছে যায়নি।

যাইহোক,সমরেশ মজুমদার তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের কিন্তু উদ্বাস্তু সমাজ থেকে তুলে ধরেননি,উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সাথে কলকাতাকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তরাই ও ডুয়ার্স মূলত রাজবংশী,আদিবাসী,নেপালী,পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশান্তরীদেরই বসবাস। উক্ত অঞ্চল থেকে তাঁর অধিকাংশ চরিত্র গড়ে উঠলেও প্রধান চরিত্র বা বিশিষ্ট চরিত্রদের কিন্তু উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী সম্প্রদায় গুলি হতে নেননি,নিয়েছেন কলকাতা,নদিয়া,বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত তথাকথিত ঘটি পরিবার গুলি হতে। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি তিনি যদি তাঁর চরিত্র নির্মানে অঞ্চলের বৈষম্য না ঘটিয়ে সকল সম্প্রদায়কেই প্রাধান্য দিতেন তবে উপন্যাস গুলি আরও বাস্তপোযোগী ও সময়োপযোগী হত। যেমনটি হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘কেয়াপাতার নৌকো’-যেখানে তিনি মূল চরিত্রকে বাঁকুড়া জেলার ঘটি পরিবার থেকেই পূর্ববঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকমূহুর্তে। এবং সেই পরিবারটিকেই কেন্দ্র করে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে দেশ ভাগ কেন্দ্রীক অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অপরদিকে ‘অর্ধেক জীবন’ এর স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছেন *‘দেশ স্বাধীন হল,আমরা দেশ হারালাম’।* তিনি বাঙাল পরিবারের সন্তান হয়েও বিয়ে করেছিলেন কলকাতার খাস ঘটি পরিবারে। এক্ষেত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর দাম্পত্য জীবন কিন্তু সুখেরই ছিল;বাঙাল কবির ঘটি স্ত্রী কিন্তু সবকিছুর মধ্যে বৈষম্য না খুঁজে সামঞ্জস্যকেই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সুনীলবাবু আরও জানিয়েছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঘটি পরিবারের প্রতিনিধি হওয়ায় বাড়িতে বোয়াল মাছ খাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি কিন্তু সুনীলবাবুর বাড়িতে তিনি নির্দ্ধিয়ায় বোয়াল মাছ এবং বাঙাল রান্না খেয়ে প্রশংসাই করেছেন। আমরা আরও বলতে পারি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন বাঙাল হলেও ঘটি সমাজ কিন্তু তাঁকে বিদ্রুপ করেনি এমনকি বিখ্যাত ফুটবলার চুনী গোস্বামী বাঙাল হয়েও মোহনবাগান ক্লাব থেকেই তিনি সর্বভারতীয় হয়েছেন। তাই ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান ক্লাবকেও বাঙাল ও ঘটিদের ফুটবল ক্লাব বলে বিভেদ করার কোন মানে নেই। কেননা শিল্প,সাহিত্য,চারুকলা,ভাস্কর্য প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে কোন জাতি,সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বা ঘটনার কথাকেই তুলে ধরে বা তার ঐতিহ্য বহন করে থাকে। দেশভাগের পূর্বে দুই বঙ্গই ভারতের সমৃদ্ধশালী এলাকা ছিল কিন্তু রাজনৈতিক ও দ্বিজাতি তত্ত্বের কারণে বঙ্গভঙ্গ হলেও উভয় বঙ্গের মূল অধিবাসীদের একে অপরের প্রতি বিদ্বেষের দিকে ঠেলে দেওয়া মূর্খামী ছাড়া আর কিছুই নয়,কেননা বাংলা ও বাঙ্গালিকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা করেছে উভয় বঙ্গের বাঙ্গালিরাই।

রতন বিশ্বাস সম্পাদিত ‘উত্তরবঙ্গের ভাষা’ গ্রন্থে প্রাবন্ধিক বিমলেন্দু মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত ২৫১টি ভাষা ও উপভাষার উল্লেখ করেছেন। ভাষাগত ও অবস্থানগত দিক থেকে তিনি দুইবঙ্গের অধিবাসীদের ঘটি-বাঙাল প্রভেদ না করে মিশ্র বাঙ্গালী চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। বিমলেন্দুবাবু তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন-‘*দেশ বিভাগের পরবর্তি কালে বিভিন্ন পর্বে যে সব বাস্তুহারা এ জেলায় এসেছেন এবং আসাম থেকে উৎখাত হয়ে যে সব বাঙালি বাস্তুহারা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন,এঁদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এঁরা নেপালীদের মতোই পরিশ্রমী এবং কর্মকুশল। ফলে গত ৩-৪ দশকের মধ্যে কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সরকারি অনুদান ছাড়াই নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি ঘটিয়েছেন। এঁদের কর্মতৎপরতা জেলার অন্যান্ন অধিবাসীদেরও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে উৎসাহিত করেছে।............এঁরা ছাড়া জেলার চা বাগান গুলির জন্মলগ্ন থেকে সেই সূদুর প্রাচীনকালে একদল বাঙালি এসে চা বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন। চাবাগানের এই কর্মচারীরা সাহেব এবং চা শ্রমিকদের কাছে ‘বাবু’ নামে পরিচিত। এঁরা এসেছিলেন অবিক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে। এঁরা যে ভাষায় এক একটা চা বাগানে কথা বলতেন তাকে বলা যেতে পারে ‘বাবু বাংলা’।* অর্থাৎ যাঁদেরকে আমরা ঘটি বলে জানি বিমলেন্দুবাবু তাঁদেরই বাবু বাঙ্গালি বলে উল্লেখ করেছেন। বিমলেন্দুবাবুর প্রবন্ধানুসারে জলপাইগুড়িতে আসাম ও পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা ব্যবহারকারী বাঙ্গালি এবং বাবু বাঙ্গালিরা সহবস্থান করে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবু বাঙ্গালিদের সাথে উররবঙ্গের ভূমি পূত্রদের আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা আমরা পাইনা। খুব অচিরেই বাবু বাঙ্গালিদের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন হয়েছিল বঙ্গালী উপভাষা ব্যবহারকারীদের অর্থাৎ বাঙালদের। তাই ঘটি বাঙাল মিলে এক নতুন শ্রেণী বাটি বাঙ্গালির সাথে আমরা পরিচিত হই, যে কথা সমরেশবাবুও উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশের সিমান্তবর্তী জেলা গুলোর ভাষা,সংস্কৃতি,খাদ্যাভাসের মিল থাকায় দুই বঙ্গের সীমান্তবর্তী বাঙ্গালীদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন হয়েছে ঘটি বাঙাল তিক্ততাকে দূরে সরিয়ে। যেমনটি হয়েছে রংপুরের বাস্তু হারাদের সাথে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের। কিন্তু পশিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাদে অন্যান্য জেলা যেমন বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল গুলোর সাথে পূর্ববঙ্গের বাস্তু হারাদের আত্মিয়তা গড়ে উঠেনি বলেই চলে। কেননা এই অঞ্চল গুলোতে উদ্বাস্তুদের বসবাসও খুব কম এবং রীতি নীতিরও বিস্তর ফারাক,তাই কেউই কেউকে মেনে নেয়নি বা নিতে পারেনি। আবার উত্তরবঙ্গ জুড়ে বাঙ্গাল,রাজবংশীরা সহবস্থান করলেও উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে আত্মীয়তা স্থাপন হয়নি;যেমনটি হয়নি বাবু বাঙ্গালিদের সাথে রাজবংশীদের। তাই ঘটি বাঙাল মিলে বাটি শ্রেণীর উদ্ভব হলেও রাজবংশী বাঙ্গাল বা রাজবংশী ঘটি মিলে নতুন কোন শ্রেণীর কথাও সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাস গুলিতে কোথাও উল্লেখ করতে পারেননি।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জী

১। সমরেশ মজুমদার,কালবেলা,আনন্দ পাবলিশার্স,সপ্তবিংশ মুদ্রণ ১৪১৭,কলকাতা

২। সমরেশ মজুমদার,কালপুরুষ,আনন্দ পাবলিশার্স,উনবিংশ মুদ্রণ২০১১,কলকাতা

৩। সমরেশ মজুমদার,সাতকাহন,আনন্দ পাবলিশার্স,প্রথম অখন্ড সংস্করণ ২০০৯,কলকাতা

৪। সমরেশ মজুমদার,পরানের পদ্মবনে,সাহিত্যম,প্রথম প্রকাশ কলকাতা বই মেলা ২০১২,কলকাতা

৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী,দশম সংস্করণ ১৪১৬,কলকাতা

৬। সুকুমার সেন,বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-চতুর্থ খন্ড,আনন্দ পাবলিশার্স,পঞ্চম মূদ্রণ ২০০৭,কলকাতা

৭। সুকুমার সেন,ভাষার ইতিবৃত্ত,আনন্দ পাবলিশার্স,নবম মুদ্রণ ২০০২,কলকাতা

৮। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,মডার্ন বুক এজেন্সী,দশম পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯০,কলকাতা

৯। রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের ভাষা,বইওয়ালা,প্রথম প্রকাশ ২০০৪,কলকাতা

১০। অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যা,ভাষাতত্ত্ব-বাংলা ভাষার ইতিহাস,মন্ডল বুক হাউস,চতুর্ত সংস্করণ,কলকাতা

১১। শৈলেন বিশ্বাস(সঙ্কলিত)সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,সাহিত্য সংসদ,অষ্টাদশ মুদ্রণ ১৯৯৫,কলকাতা

১২।প্রফুল্ল রায়,কেয়াপাতার নৌকো,করুণা প্রকাশনী,অষ্টম অখণ্ড সংসকরণ ২০১২,কলকাতা

১৩।সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,অর্ধেক জীবন,আনন্দ পাবলিশার্স,ষষ্ঠ মুদ্রন ২০১০,কলকাতা

\*\*\*

ক) অভিজিত সাধুখাঁ, অভিজিত ব্যানার্জী- ঘটি-বাঙালের সামাজিক চিহ্নক:ইতিহাস,প্রেক্ষিত,প্রাসঙ্গিকতা(প্রবন্ধ),দেশভাগের সাহিত্য:স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার,আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র,নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা

খ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রবাদটি দিয়ে সাহায্য করেছেন-অধ্যাপিকা নমিতা ভট্টাচার্য,বাংলা বিভাগ,কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

গ) রাঢ়বঙ্গ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন-তন্ময় মন্ডল,গবেষক,বাংলা বিভাগ,কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ঘ) রাজবংশী জনজাতি বিষয়ক তথ্য দিয়েছেন-রাজু রায়,ভোটপট্টি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ

**বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই : সাম্প্রতিক কালের বাংলা আখ্যান**

**অনুপম সরকার**

**গবেষক, বাংলা বিভাগ**

**আসাম বিশ্ববিদ্যালয়**

ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়, বর্তমান অতীত – এ যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যেতে হয় । আর মানুষের জীবনে এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিই অধিকতর ক্রিয়াশীল । এরই নাম ইতিহাস, ক্রমবিকাশও একেই বলে । সমাজ, রাজনীতি ও জীবন ধারায় ভাঙচুর ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জীবন এই প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হয় আর এই ধারাতেই ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নিজেকে আবিস্কার করে । বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও একুশ শতকে সাহিত্য ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আখ্যানতত্ত্বের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে । আজ ইতিহাসের তথ্যগত সত্যতাই একমাত্র বিবেচ্য নয় । রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন, ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে যে বিশেষ রস সঞ্চারিত হয়, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, সত্যের প্রতি তাঁর কোনও খাতির নেই – এই বয়ানও আজ তাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে । আসলে যে কোনও নির্মাণের মতোই ইতিহাসও এক নির্মাণ মাত্র । এই নির্মিত সত্য নিয়ত পরিবর্তমান একটি ধারনা যা চিরন্তনও নয়, মহান নয়, নিত্য ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী । এই নশ্বরতাকে স্বীকার করেই আজকের ইতিহাসের যাত্রা , আজকের আখ্যানের প্রবাহমানতা । সময়ের পরিবর্তনের সাথে প্রজন্মান্তরের চেতনার পরিবর্তন হয়, যুগের পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে সমজকেও আঘাত করে । বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি বাঙালির বিশ্বাসকে যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে তাঁতে তুলোট কাগজের মতোই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে পুরনো মূল্যবোধ, মানুষের ভিতরে জেগেছে অস্থিরতা ও সংশয় । পরস্পর বিরোধী চেতনা নিয়ে সাধারণত সময় বর্তমান থাকে । একটি ধারা স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, অন্য ধারাটি চায় স্থবিরতাকে উতরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে । প্রথমটি পশ্চাৎমুখী, পরেরটি অগ্রসরপ্রবণ । এক সময় দুটি ধারার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং স্থাণুকে পরাজিত করে অগ্রবর্তী সময়চেতনা নতুন ক্ষেত্রে এসে স্থির হয় এবং পরবর্তীকালে সেই ক্ষেত্রোথিত চেতনায় ফের দ্বন্দ্বের খেলা জমে । ইতিবাচক সময় এভাবেই সামনে অগ্রসর হয় ।

উৎপলেন্দু মণ্ডল এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ লেখক । তাঁর বেশীরভাগ লেখাই সুন্দরবন কেন্দ্রিক । ওই অঞ্চলের মানুষজনের সুখ, দুঃখ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, শিক্ষা, অশিক্ষা, আর বেঁচে থাকার লড়াই তাঁর অধিকাংশ লেখার মূল উপজিব্য । তাঁর “ **‘আয়লা সময় অসময়’ ধ্বংসের ধারাবিবরণী, বাপকাকাদের ভিটেয় আয়লার জলোচ্ছ্বাস । সর্বস্ব হারানো মানুষগুলো, অন্য ঠিকানা খুঁজতে ব্যস্ত । তখন আয়লার নদী পূর্বাশ্রমে ফিরে যায় । মানুষ আর ফিরতে পারে না । যদিও বা ফেরে – তখন সব হারানো এক মানুষ । কিংবা মানুষ নয় অন্য কিছু – এই অন্য কিছুতে রাষ্ট্রের, রাজপুরুষদের কিছু যায় আসে না । আসে রিলিফ । করুনাময় দেবতার নামে – নাম সংকীর্তন হয় । বছর গড়ায় । আবাদমলের মাটি নোনা হয় । নিস্ফলা মাটি আর নিষ্কর্মা লোকগুলো পাড়ি দেয় দক্ষিনে। ”**

মানুষের অসহায়তা-নিরাশ্রয়তাকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক । যেখানে প্রতিটা দিন বাঁচার অর্থ কেবলই সংগ্রাম । মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সময় যেন নিমেষে বদলে গেছে । তেষ্টা মেটাবার পানীয় জলটুকু আজ মেলা ভার । জীবন সম্পূর্ণ নোনতা স্বাদে বদলে গেছে । ***“চারপাশের সব জল নোনা । নোনা বিষ সাঙ্ঘাতিক, গায়ে খোস পাঁচড়া হয় । দরকার******একটু মিষ্টিজল । সে জল আর পাবে কোথায় ? ঐ টিউবওয়েলের জল নিতে হবে । আবার জলের মতো নোনা জলে চান করতে হবে । হ্যাঁ দেখে নিস তোর ঐ গতরে পোকা পড়বে । ততক্ষণে দলটা এগিয়ে চলেছে, গাঙভেড়ী দিয়ে যাওয়া যাবে না । তার উপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে । গোয়ালবাড়ি দিয়ে যাওয়া যায় । জ্যাঠা মারা যাওয়ার পরে সব শেষ । তিনটে বড় বড় ঘর নিয়ে ছিল গোয়ালঘর । সে সব শেষ । সেখানেও জল, ডান দিকে জ্যাঠার বড় পুকুর । কত দিনের মাছ সব রেখে দিত । ছেলের বিয়ে হবে । তখন কাজের সময় আর মাছ পাওয়া যাবে না । সেই পুকুরে এখন নোনা জল খেলে বেড়াচ্ছে । কিন্তু কোনপথ দিয়ে যাবে । নদীর জল, বাঁধ ছাপিয়ে শান্তিলাল খুঁজছে । তার বাপ, কাকারা, সব শান্তিখালের পাড়ে বাড়ি করেছে । সেসব বাড়িতে এখন জল ঘোলাচ্ছে।”* (পৃষ্ঠা-১৬)।**

এসবের মাঝে আছে একদল সুবিধাভোগী–ঠকবাজের দল, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে আর কারুর কথায় ভাবে না। কে বাঁচল, আর কে বা মরলো তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না । এই ধরনের মানুষ চিরকাল ধরেই সমাজে রয়ে গেছে । রাজনীতির আদপ-কায়দা বুঝে নিতে এঁদের দেরি হয়না । ফলে যে প্রকৃত অসহায়, সে চিরদিন বঞ্চিত থেকে যায়আর চালাক বুজরুকবাজের দল ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠে । ***“অদ্ভুতভাবে শুক্রী মালী বেঁচে গেছে । বেঁচে গিয়ে অশান্তি কম না- সবাই টাকা পেয়েছে শুক্রী আর পায়নি । শুক্রীর এক ভাই সোনারপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করে, সেও টাকা পেয়েছে । কিন্তু শুক্রী পায়নি । মহাদেব পাগলা পায়নি । প্রশাসন পাগল ছাগল দেখেনা । সহদেব পাগলা প্রতিদিন পালা করে বসে থাকে । পঞ্চায়েত অফিসের বারান্দায় গিয়ে বসে । নদীর চড়ে বাটাং পাখি দেখে******হাততালি দেয় । ইঞ্জিনভ্যান দেখে ভাবে রিলিফ আসছে । সবাইকে জিজ্ঞেস করে কবে টাকা পাওয়া যাবে ।”* (পৃষ্ঠা-৯০)**

উৎপলেন্দু মণ্ডলের এই আখ্যানে মানুষের আত্মোপলব্ধি ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরাল ভাবে পৌরসমাজের গভীরে গ্রামীন শক্তির বিন্যাসও ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে থাকে । ***“কালো কমরেড দেখছিল, তাদের কিছু করার নেই, তাদের লোক চলে গেছে ওদের দলে । ওখানে এখন পয়সা । পয়সা যেখানে হবে সেখানে তো লোক যাবেই- কি আর করা যাবে । কিছুই করার নেই । ... মনে মনে কালো বলে আর আমাদের ক্ষমতা নেই । এবার সব তোমাদের বাড়ির লোকদের, তোমার কাকা জ্যাঠার ছেলেরাই করবে ।”* (পৃষ্ঠা- ৯৫-৯৬)। তাই “নোনতা স্বাদে-গোত্রে ‘আয়লা সময় অসময়’ এক অন্যরকম কাহিনী ।”**

তৃষ্ণা বসাকের ‘বারিঘর’ ***“উপন্যাসের ভরকেন্দ্রও নিরাশ্রয়তা । গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে ঘটলেই হিংসা, সন্ত্রাসের ভয়াবহতা কমে না, বিস্তার কিছু ছোটো হয় – এইমাত্র । আরো অনেক ছোট-বড়, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ বল – এর বিভিন্ন তলে ক্রিয়াশীল, যারা কথাবস্তুর একমুখিনতাকে ভেঙে দিতে চেয়েছে নিজেদের মতো করে ।”***

*আখ্যানের শুরু থেকেই লেখিকা স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন । ঢুকে গেছেন সমস্যার অতলে । এ এক পরিবারের কাহিনী যেখানে শুরুতেই ঘটে গিয়েছে এক দুর্ঘটনা । আর সেই দুর্ঘটনায় বদলে গিয়েছে সকলের জীবন । যেখানে কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা নেই ।* **“নিজের ঘরটুকু, চার ঘণ্টার চাকরি আর আত্মহননের ধিকিধিকি ইচ্ছে – এই সব দিয়ে একটা** **শামুকখোল বানিয়ে নিয়েছে অজিত ঘোষাল। হ্যাঁ, নিজের ঘর । শুভাশিসের মৃত্যুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন তিনি ।” *(পৃষ্ঠা-৭)।***

*যখন ঋতুর আসা-যাওয়াও ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না মানুষ তখন বোঝা যায় সমস্যা কত গভীর । আধুনিক কৃত্তিম জীবন যাপন কিছু দিন পরেই মানুষের মনে পরিবর্তন আনে । কারুর কাছে তা হয়ে উঠে দমবন্ধকর পরিস্থিতি আবার কেউ কেউ সেই পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে । কারুর স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যায় আবার কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ে নতুন সম্পর্কে ।* “কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, বিশ্বাস – এগুলো যে বড় দামি জিনিস, বড় কস্ট করে বুঝেছে বিশাখা । দেবাশিসদার কথাটা সত্যি, তাকে বেঁচে থাকতে হবে । কিন্তু কোথায় ? আর কতদূর হাঁটলে সে নিজের বাড়িতে পৌঁছবে ? পৃথিবীতে কোথাও কি তার জন্যে একটু জায়গা আছে ? নেই, তার জায়গা তাকেই করে নিতে হবে । হাতে এক মুঠো ধুলো নিয়ে কি একটা গোটা বাড়ির স্বপ্ন দেখা কি মানায় ?” *(পৃষ্ঠা-৭০)*

*যৌনতাকেও খুব সচেতনভাবে এই উপন্যাসে এনেছেন লেখিকা । কখনই তা আখ্যানের গতিকে নষ্ট করেনি । সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জীবনে যৌনতার গুরুত্ব যে কতখানি তা সম্ভবত নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা । লেখিকা খুব যত্ন করে বিষয়টিকে আখ্যানে ব্যবহার করেছেন।* **“আজ অচিন যখন ওকে ডাকল, তখনও বিশাখা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে ছিল । কিন্তু এই জায়গাটাই এসে, শরীর ক্রমশ তরল হয়ে যাচ্ছে বিশাখার । নদীর মতোই বয়ে যেতে চাইছে । আধো অন্ধকারে অচিন দেখল বিশাখার প্রদীপ** **শিখার মতো দুই চোখের তলায় গভীর কালি । সেই কালো গিরিখাত দিয়ে গঙ্গা নামছে । অচিন বিশাখার মাথা ওর কাঁধে টেনে নিল ।” *(পৃষ্ঠা-৬৩)।***

*এই সময়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক সুকান্তি দত্ত মনে করেন,* “জীবন ঘনিষ্ট বিশ্বাস্য – বাস্তবের মায়া সৃজনের তাগিদ থেকে উপন্যাসের জন্ম হলেও, জীবনপ্রবাহের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে তার নানা রুপবদল ঘটেছে ।...গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির নানা বাঁকবদল, জ্ঞানচর্চার নানা নতুন দিকের বিস্তার জন্ম দিয়েছে মীমাংসাহীন জীবনবোধ, বহুস্বরিক জীবনব্যাখ্যা । ...*সব মিলিয়ে মননশীল শিল্পসচেতন বাংলা উপন্যাস নানা নতুনতর বৈশিষ্ট্য অর্জন করে চলেছে ।”* আসলে সত্যি খুব দামি কথা বলেছেন সুকান্তি দত্ত । বাংলা উপন্যাস সত্যি আজ এক জায়গায় থেমে নেই । বাস্তব অন্বেষণের বৈচিত্র্যময় পথে আজকের বাংলা উপন্যাসের যাত্রা । তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়,অমর মিত্র, প্রমুখ কথা সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা আখ্যানের এই বাঁকবদল । আর এই যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মের কিছু মেধাবী সাহিত্য সাধক । সুকান্তি দত্ত তাঁদের মধ্যেই একজন ।

‘মায়াউড়ান’ সুকান্তি দত্তের তৃতীয় উপন্যাস । “সত্তরের গণ-আন্দোলনের শহিদ পুত্র রাজনৈতিক কর্মী শ্যামসুন্দর মায়ানগর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন *কাউন্সিল মেম্বার । দলের ভেতরে-বাইরে তার লড়াই অসাধু প্রমোটার – ঠিকাদার – রাজনৈতিক চক্রের বিরুদ্ধে । তার পিঠে জেগে উঠল একজরা* ***ডানা , সে উড়ে বেড়ায় নদী – পাহাড় – সমুদ্র – আকাশে, কথা বলে তর্ক করে নানা চরিত্রের সঙ্গে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বিকর্ণর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখনওবা সে নিজেই বিকর্ণ হয়ে যায় । প্রেমিকা শ্রীরাধাকে নিয়ে উড়ান দিতে চায় আকাশে । আলো আঁধারময় কুহকমগ্ন কথন শৈলীতে উঠে আসে ক্ষমতা রাজনীতি সহ জীবন ঘিরে নানা প্রশ্ন সংশয় অনুভব । জিজ্ঞাসা ও স্বপ্ন, প্রতিবাদ ও প্রেমের এই নতুন স্বাদের আখ্যান বাংলা উপন্যাসের মননশীল শিল্পসচেতন ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ।”***

*উপন্যাসের বয়ানে সময় একেবারেই যুগপৎ অন্তর্বৃত ও বহিবৃত । সময় ও পরিসরের ক্রম নির্ভর বিন্যাস আখ্যানের পক্ষে আবশ্যিক । আলো আঁধারময় কুহকমগ্ন অসম্ভবের দ্যোতনায় এই উপন্যাসে লেখক ভরাট করতে চেয়েছেন যাবতীয় শূন্যস্থান। বাংলা কথাসাহিত্যের পরিচিত কাহিনীনির্ভর প্রচলিত কথনশৈলী থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন লেখক । নন্দনের স্বাতন্ত্র্যময় উপস্থিতি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায় । বিস্ময়বোধের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দিয়েই আখ্যানকার গড়ে নিতে চান অদৃশ্য এক সেতু । প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যায় ইতালো ক্যালভিনোর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সিক্স মেমোস ফর দি নেক্সট মিলেনিয়াম’-এর উপসংহারের কথা । তাঁর মতে, “Who are we, who is each one of us, if not a combination of experiences, information, books, we have read, things imagined ? Each life is our encyclopedia, a library, an inventory of objects, a series of styles and everything can be constantly shuffled and reordered in every way conceivable.”*

*রাজনৈতিক ভাবাদর্শের তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি আখ্যানের পরিস্ফুটনে কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি । বিষয়বস্তু গৌণ হয়ে উঠে নি কখনও । আসলে ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি, থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত স্তরেও যে বিকল্প সন্ধানের প্রয়াস স্বাধীনোত্তরকালে লক্ষ্য করা গেছে, তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছেন লেখক । মনের অতলের স্পন্দন ও রুপবদলকে যারা সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বড় মাপের শিল্পী । ‘মায়াউড়ান’ পাঠ করে পাঠকের সম্ভবত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না ।*

*‘চরণ’ উপন্যাসের লেখক শরদিন্দু সাহা* “সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি, অনুশাসন এবং শোষণ মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন, আর এই বাসনাতেই তার কলম ধরা । ভারতবর্ষ উচ্চ কৃষ্টি ও বহুধা মিশ্রিত সংস্কৃতির দেশ । কিন্তু আজ তার এ কী পরিণতি! সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক শক্তির হাতের তালুতে বন্দী, শিক্ষিত শ্রেণী হচ্ছে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি, রাজনেতাদের আশ্রিত মস্তানদের উল্লম্ফনে সংকুচিত, শিহরিত সকলে, পোশাকি গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে মানুষের বাকশক্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কৌশলে; আদেশ পালনে নিমরাজি হলে নেমে আসছে বঞ্চনার খড়গ এবং ধর্ষিতা নারীর অপমানের জবাব চাইলে মিলছে ভর্ৎসনা । এমনই এক সমাজ থেকে উঠে এসেছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যিনি সর্বস্ব পণ করেও সমাজকে পাল্টাতে পারেন নি, বরঞ্চ দুর্বৃত্তদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে বিপন্ন হয়েছে তাঁর জীবন । হতাশা, আশা – নিরাশার দোলা চলে আবর্তিত হয়ে মানবতার অপমানের জ্বালা মূর্ত হয়েছে নানা স্বরে গোটা উপন্যাস জুড়ে । এই উপন্যাস যেমন প্রতিবাদের, পরাজয়েরও বটে, বর্তমানের আরশিতে অতীতকে আমন্ত্রণের এক নতুন দিশা ।”

*আসলে যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনের চরমতম সংকটমুহূর্তের সামনে এসে পড়ে, বুঝতে পারে প্রকৃত পরিস্থিতি, তখন তাঁকে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেকেই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় । সে তার স্বকীয়তা – স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে । উপলব্ধি করে বেঁচে থাকার অর্থ । মানুষ মাত্রেই বয়ে নিয়ে বেড়ায় নৈতিক, স্বাধীন, আবেগ । তার বেঁচে থাকাও তাই তুচ্ছ সাধারণ বিষয় নয় ।*

*বিশ্বায়নের যুগে আজও ধর্মাচরণ আর বিশ্বাসের কারণে, ঈশ্বরের নামে, মানুষের হত্যাকাণ্ড ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে চলেছে পৃথিবীতে। আর এই অধিবিদ্যাকে চ্যালেঞ্জ জানানো মানুষকে পড়তে হয় নানাবিধ প্রতিকূলতার সামনে । জয়ের সাথে সাথে পরাজয়েরও মুখোমুখি হতে হয় তাকে । অধিবিদ্যার অসমগত প্রভাব যে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের রুচি, ভাষা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে । সময়ের মায়াবী খেলায় নিজেকে যোগ্য করে তুলতে না পারলে রক্ষা করার কিছু থাকে না আর । আজকের সমাজে যেখানে ভোগবাদ নামক অসুখে অধিকাংশ মানুষ আক্রান্ত, বিভ্রান্ত, সেখানে লেখক এমন এক চরিত্রকে আঁকতে চেয়েছেন যে অন্তত সমাজ বদলাবার কথা ভাবে । যার মধ্যে চেষ্টা মরে যায়নি । আজ হয়ত সে সফল হয়না তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে, কিন্তু তার প্রচেষ্টা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায় । বর্তমান সময়ের নাগরিক, আধা-নাগরিক, ও গ্রামীন পৌর সমাজের জটিল দহনকথা আরও স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া যায় শরদিন্দু সাহার ‘চরণ’ উপন্যাসে ।*

‘বিষয়ান্তরে প্রবহমানতার পাঁচালী’ আখ্যানের লেখক রবিন ঘোষ তাঁর এই রচনার ভূমিকা অংশে লিখেছেন, “**রাতারাতি হতবুদ্ধিহীন ভাবে বামপন্থী সাজার নাটকটা খারাপ লাগে না । স্রেফ ষড়যন্ত্রী মনে করা না করা নিয়ে হাসি পায় । সাম্যবাদ বিরোধীরা সাম্যবাদী মঞ্চে, তখনই দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কেমব্রিজ হাভার্ডকে পাশ কাটিয়ে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্যে অধ্যক্ষ পেটানো, যা ওঁছা-ঝটতি-পড়তিদের তাণ্ডবে শিক্ষায় বিপ্লব ঘটানো রক্তচ্ছ্বাসের আকুতিটুকু নিয়ে ‘কারু মুখে দ্বিরুক্তি নেই- পথ নেই বলে শতাব্দী শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে’।”** *অর্থাৎ প্রথমেই লেখক তার রচনার সারবত্তা নিয়ে একটা আভাস পাঠককে দিতে চাইলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয় । রবীন্দ্র –যুগ থেকেই ঘটনা পরম্পরার বিবরণের বদলে বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উন্মোচন বাংলা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হিসেবে উঠে এসেছে। বহুস্বরিক জীবনব্যাখ্যা ও মীমাংসাহীন জীবনবোধ উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে । আর রবিন ঘোষের এই সাম্প্রতিক উপন্যাস পাঠ করে আমাদের মনে হয়, তিনি সেই বিরল গোত্রের লেখক যার লেখা পড়তে গেলে ভাবতে হয়, তথাকথিত ঔপন্যাসিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত লেখার তাৎপর্য নিয়ে। ভাবতে বাধ্য হতে হয় পাঠের বাকসংহিতা, আখ্যানের আকল্প বা ডিজাইন নিয়ে । ভাবতে হয় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের মধ্যে ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির কথা। ভাবতে হয় প্রকরণগত শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল হিসেবে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা নিয়ে।*

*কোনও কোনও পাঠকের মনে হতেই পারে তত্ত্বচিন্তার প্রগাঢ় উপস্থিতিতে এই উপন্যাসটি পাঠ করার আনন্দ ব্যাহত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত উপন্যাসের অভ্যস্ত আকল্পটির সৃষ্টি হয়েছে প্রতীচ্যের কিছু নির্দিষ্ট ধারনার উপর ভিত্তি করে। কোনও পাঠে তত্ত্বের উপস্থিতির অর্থ তো, সুশৃঙ্খলিত অবস্থান । তাই তত্ত্বকে অস্বীকার করার অর্থ আসলে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ভ্রমের সাথী হওয়া ।*

*জয় ভদ্র এই সময়ের তরুণ কথাকার । ইতিমধ্যেই তার লেখা পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে । এসময়ের অন্য অনেক তরুণ লেখকদের মতো জয়ের লেখাতেও ফুটে উঠে স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার অদম্য ইচ্ছা । নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গি তৈরিতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট তিনি । বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয় । সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কথা গভীরভাবে ফুটে উঠে তাঁর লেখায় ।*

*‘ইডিকেস’ জয় ভদ্রের সাম্প্রতিক গল্প সংকলন । প্রথমও বটে । গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে মোট ১১ টি গল্প । এগুলি হল,* **আগামীকাল, নীলাভ থুতু, উত্তরাধিকার, ৫৬তম স্বাধীনতা দিবস, এক অজানা জনপদের উপকথা, শহরে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা, হাম্বা, ইডিকেস, ভয়াল বিস্ফোরণের পরের ঘণ্টাগুলো, পরদিন শহরে কারফিউ ঘোষিত হয়েছিল, *এবং* ওহ।**

*এই গল্পগ্রন্থে লেখক এঁকেছেন অশান্ত, অস্বস্তিকর, হিংসায় পরিপূর্ণ সমাজের ছবি।* **“এই গল্পগুলি আসলে রাজনৈতিক রূপক। লেখকের কণ্ঠস্বর প্রতিবাদী, কিন্তু শিল্প সম্মত । সব সময়ই নানা অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাশিত** **ঘটনা ঘটে । লেখক পাঠককে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রান্তসীমায় নিয়ে গিয়ে চমকে দিতে চান। আর সেই জাদুবাস্তবতাময় চমকের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তিনি একটি অভিশপ্ত সময়ের মানচিত্র আঁকতে চান ।”\***  *জাদুবাস্তবতাময় এই রচনায় প্রান্তজনের স্বপ্নের বুননকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আলোয় আনতে চেয়েছেন লেখক। পাঠকের কাছে সর্বদা কাহিনীগুলি সুখস্মৃতি বয়ে না আনলেও, এনেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিশেষত,* **ইডিকেস, হাম্বা, শহরে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা, ওহ,** *গল্পগুলিতে এই অনুভূতি পাঠকের স্বভাবতই হতে পারে। আজকের আধুনিক সময়ে বিশ্বাস – অবিশ্বাসের জলবিভাজনরেখা মুছে গেছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিস্ময়হীনতার সংক্রমণ নির্বাধ হয়ে উঠলেও তাঁরা বাস্তবের অবতলে অজস্র অন্ধবিন্দু ও শূন্যস্থানগুলিকে খুঁজে নিচ্ছে। চেনা আদলের মধ্যেও ফাঁকফোকর খুঁজে চলে আসছে অচেনা আদল। জয় ভদ্রের এই গল্প সংকলনের কাহিনীগুলিও তার ব্যতিক্রমী নয়।*

এই আলোচনার পরিশেষে আমরা স্মরণ করে নিতে পারি অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের উপন্যাস সংক্রান্ত ভাবনাকে। তিনি মনে করেন, **“আখ্যানতত্ত্বের অভিনবত্ব এখন উপন্যাস – গ্রন্থনার চিরাগত ধারণাকে পশ্চাৎভূমিতে ঠেলে দিয়েছে। সমালোচকদের ভাববিশ্ব আন্দোলিত হচ্ছে নানা ধরণের চিন্তা সন্ত্রাসে। আসন্ন মুহূর্তের জিজ্ঞাসায় দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে ভূতপূর্ব মুহূর্তের প্রশ্নাবলী । কোনো গল্প নেই জীবনে, নেই কোনো আরম্ভের, সমাধানের নিশ্চয়তা । এরই মধ্যে পথ-পাথেয়-গন্তব্য খুঁজে চলেছেন** **কথাকারেরা আর উপন্যাস ভাবুকেরা । তাঁদের মধ্যে কখনও মৈত্রী কখনও বা ব্যবধান । এমনকী, কখনও তাঁরা পরস্পরের কাছে যুযুধান প্রতিপক্ষ ।” #**

**\*এই সময় (দৈনিক সংবাদপত্র)/ তারিখ- ০৬-১০-২০১৩/ কলকাতা ।**

**# উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ/ পৃঃ- ১৩৬/ তপোধীর ভট্টাচার্য/ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ/ কল- ০৯।**

**গ্রন্থ পরিচয় -**

১। আয়লা সময় অসময়/ উৎপলেন্দু মণ্ডল/ বইওয়ালা/ কলকাতা- ৫৯।

২। বাড়িঘর/ তৃষ্ণা বসাক/ একুশ শতক/ কলকাতা- ৭৩।

৩। মায়াউড়ান/ সুকান্তি দত্ত/ পাল পাবলিশার্স/ কলকাতা- ০৯।

৪। চরণ/ শরদিন্দু সাহা/ করুণা প্রকাশনী/ কলকাতা- ০৯।

৫। বিষয়ান্তরে প্রবহমানতার পাঁচালী/ রবিন ঘোষ/ বিজ্ঞাপনপর্ব/ কলকাতা- ০১।

৬। ইডিকেস/ জয় ভদ্র/ কথক/ কলকাতা- ৬৩।

**রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা : রং তুলি নক্‌সিকাঁথা**

**ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়**

**অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ**

**কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়**

সেখানে জীবনের কোন টানাপোড়েন বা বিচ্ছেদের বেদনা কবিকে স্পর্শ করতে পারেনা।

এক নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্য দিয়ে কবি-জীবন বয়ে চলে নদীর স্রোতের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করেন হয়ত একটু বেশি বয়সে। কিন্তু তাঁর ছবি আঁকার প্রবণতা বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর কল্পনায় – তাঁর মানসিকতায়। ছোটবেলা থেকে তিনি যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তা নিজের মনে কল্পনার রং মিশিয়ে এঁকে চলেছেন জীবন পর্যন্ত। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’, ‘ছবি ও গান’, ‘সোনার তরী’, ‘চৈতালি’ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্বে লেখা ‘ছেলেবেলা’ - তাঁর ছবি আঁকা চলেছে নিরন্তর গতিতে। আকারগত দিক থেকে ‘ছেলেবেলা’কে এক সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় বলেই মনে হয়। কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে বৃহত্তর কবি-জীবনের বিস্তৃত পরিচয় । এ যেন তাঁর আত্মোপলব্ধির আলেখ্য। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছবির মত উঠে এসেছে তাঁর স্মৃতিতে, আর নিপুণ শিল্পীর মতো রং তুলির সাহায্যে তিনি নিজের জীবনকে এঁকে চলেছেন। গড়ে উঠেছে এক সম্পূর্ণ কোলাজ।

‘ছেলেবেলা’ লেখার বহু আগে পঞ্চাশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী ‘জীবনস্মৃতি’ লিখেছিলেন। সেখানে ছিল কবির জীবনের ২৫ বছরের কাহিনি। ‘ছেলেবেলা’য় এসে আশি বছর বয়সে জীবন-কাহিনির এই পরিসর আরও কম হয়েছে; সেখানে রয়েছে মাত্র ১৭ বছরের ঘটনাবলী। এ গ্রন্থ কবির পরিণততম কথাশিল্পের অন্যতম নিদর্শন। ‘ছেলেবেলা’ র ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – ‘‘সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদের ভাবনার উপযুক্ত।’’ কবির এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ছোটদের জন্য ছোটদের মতন করে ছেলেবেলা গ্রন্থ লিখতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, বৃদ্ধ কবি যেন শিশু হয়েই তাঁর বাল্যকালের আনন্দকে উপভোগ করে চলেছেন। আমরা জানি, পরিণত শিল্পীকুশলতা ছাড়া ছোটদের জন্য ছোটদের মতন করে লেখা কখনই সম্ভব নয়। তাই ‘বালভাষিত গদ্যে’ রবীন্দ্রনাথ ‘ছেলেবেলা’ রচনা করলেও তা কেবল শিশুদেরই নয়, এর ভাষা শৈলী বড়দেরও সমানভাবে আকৃষ্ট করে – হয়ে ওঠে গবেষণার বিষয়বস্তু।

‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর চিত্রময় ভাষাশৈলী। কবি তাঁর ছোটবেলার ঘটনাগুলিকে ছবির মত করে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। সেইসঙ্গে চলতে থাকে সমকালের একটা ইতিহাস। খুব সহজেই উঠে আসে সমকালীন কলকাতার সমাজ-পরিবেশ ও সভ্যতা- সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক চিত্র। সমগ্র গ্রন্থে এই সেকেলে কলকাতার ছবি বার বার উঠে এসেছে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কখনও কখনও তা প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের তুলনামূলক অধ্যয়নেরও রূপ পেয়েছে - “শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড় বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি।” আবার যখন “চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত ‘বরীফ’…আর একটা হাঁক ছিল ‘বেলফুল’।”- তখন পাঠকের মনও যেন কবির সঙ্গে চলে যায় সেই প্রাচীনে।

সমকালে মেয়েদের অবস্থার নিপুণ চিত্র রয়েছে এই গ্রন্থে। ‘দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরান অন্ধকারে’ তখনকার মেয়েরা বাইরের আলো খুঁজত। “কোন মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে , ফস্‌ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে , জিভ কেটে চট্‌ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে।” তবে সাজসজ্জা ব্যপারে মেয়েরা যে চিরকাল সচেতন তারও রোচক বর্ণনা রয়েছে গ্রন্থে – “তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে-মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে ব’সে, সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত। বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হ’ত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শারি, পাক দিয়ে কুঁচ্‌কিয়ে তোলা।’’ রবীন্দ্র-সমকালীন মেয়েদের এমন নিখুঁত ছবি বাংলা সাহিত্যে বিরল।

‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এমন বহু নিতান্ত-সাধারণ অপরিচিত মানুষ-জনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষক অঘোরবাবু, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নীলকমল ঘোষাল, প্যারিদাসী, কানা পালোয়ান, বিশ্বনাথ শিকারী, আবদুল মাঝি, চাকরদের বড়কর্তা ব্রজেশ্বর, ছোটকর্তা শ্যাম, দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুচর কিশোরী চাটুজ্জে প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে কবি নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করেছেন। রবীন্দ্র-পরিবারের বা পরিবারের বাইরেরও বহু বিশিষ্ট মানুষজনের চরিত্রের এক নতুন দিক উদ্‌ভাসিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

ভাষাকে সরস ও রোচক করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রসঙ্গ লিখতে লিখতে হঠাৎ করেই কবি অন্য প্রসঙ্গে অনায়াসে প্রবেশ করেছেন। তবে তাতে রচনার ধারাবাহিকতা বা সাহিত্যরস কোথাও খণ্ডিত হয়নি। বরং কবির এই অপূর্ব রচনা কুশলতায় তাঁর বাল্যকাল গল্পের আকারে উঠে এসেছে। সেখানে তাঁর গদ্য ভাষা কোথাও হয়ে উঠেছে কল্পনাপ্রবণ রূপকথাময় আবার কোথাও বা হয়েছে রোমাঞ্চকারী কৌতূহল উদ্দীপক যা রহস্যের রঙে মিলেমিশে একাকার হয়েছে। বাল্যকালের ভৌতিক অনুভূতির বর্ণনায় কবি কৌতুকের আশ্রয় নিলেও তা শিশুমনে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করে থাকে। যেমন – “ ঐ মেয়ে-ভূতটা সব চেয়ে ছিল বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের’পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘনপাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা’টা তেতলার কারনিশের’পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্‌ মূর্তি।’’ আবার অন্যত্র রয়েছে – “নীচের তলার সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মত, পা দুটো উল্টো দিকে।”

ঠাকুরমাদের আমলের অচল পাল্কিতে বসে কবিমন যখন চলেছে দূরে দূরে দেশে দেশে , তখন পাঠকও কবির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে - এক অজানা রোমাঞ্চকর পৃথিবীর সন্ধানে। সে পথ কখনও ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর যেখানে – “বাঘের চোখ জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে, গা করছে ছম্‌ ছম্‌। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্‌ ! ব্যাস্‌, সব চুপ।” কখনও বা ভেসে চলে সমুদ্রে –“যেখানে ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌-ছপ্‌ ছপ্‌-ছপ্‌ । ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে ‘সামাল সামাল, ঝড় উঠল’।’’ বড় হয়ে জ্যতিদাদার সঙ্গে শিকারে যাওয়ার বর্ণনারও জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন কবি – “আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার [বাঘের] খোঁজে হাতির পিঠে চ’ড়ে। আখের খেত থেকে পট্‌ পট্‌ করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, ভারিক্কি চালে।…. হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা।….খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুরবেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে।”

লোকমুখে প্রচলিত রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাত চরিত্র জীবন্ত হয়েছে কবির কলমে। উড়ো ঠিকানায় চলতে চলতে কবির পাল্কি একসময় এসে পড়ে সেই ডাকাতদের আড্ডায়। যেখানে- “ধূ ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্‌দুরে। দূরে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে কালীদিঘির জল, চিক্‌ চিক্‌ করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটলধরা ঘাটের দিকে ডালপালা- ছড়ানো পাকুড় গাছ।” কবির ছোটবেলায় ঠাকুরবাড়িতে ডাকাতদের খেলা দেখানোর চিত্রটিও যেন পাঠকের চোখের সামনেই ঘটে যায় –“মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপ্‌কিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ দুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়।” ছোটবেলা থেকেই চাকরদের মহলে বহুবার ডাকাতের গল্প শুনতে শুনতে কবির মনে ডাকাত সম্পর্কে হয়ত এক ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী কালেও তাঁর রচনায় এই ডাকাতের প্রসঙ্গ এসেছে অনেকবার। রবীন্দ্রনাথের ‘শিশুকাব্যে’র অন্তর্গত ‘বীরপুরুষ’ কবিতায় ছোট শিশুকে ডাকাতের হাত থেকে তার মাকে রক্ষা করতে দেখা যায় , আবার ‘শেষ সপ্তকে’র ১৯ নম্বর কবিতায় কবিকে অনেকটা নষ্ট্যালজিক হতেও দেখা যায় –

“তখন বয়স ছিল কাঁচা ;

কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,

বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,

জিন নেই, লাগাম নেই,

ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে

ভরসন্ধেবেলায় ;

ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো

ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।”

গল্প বলার ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ কথ্য গদ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন কবি। তাই প্রয়োজনে দেশি বিদেশি এবং মিশ্র শব্দের প্রয়োগ করে ভাষাকে করে তুলেছেন সহজতর। এ ভাষা কোন গভীর তাৎপর্যময় জ্ঞান সংবাহক গদ্য নয়, এর সহজ সরল ছন্দময় ভাষা শিশুমনে খুব সহজেই আনন্দ জাগায়। প্রয়োজনে স্থান বিশেষে কবির ভাষা হয়ে উঠেছে রোমান্টিক কাব্যধর্মী, আবার কোথাও তা হয়ে উঠেছে কৌতুকবাহী। যতি চিহ্নের আধিক্যে বাক্যকে ছোট ছোট করে তাকে গল্পের আকার দিয়েছেন কবি। ফলে এ- ভাষা সর্বাংশে হয়ে উঠেছে শিষ্ট চলিত গদ্য।

একদিকে সমাজের বাস্তব চিত্রণের রূপ অন্যদিকে কল্পনার পাখা মেলে দূর সীমানার ওপাড়ে পাড়ি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা; একদিকে জীবনে বড় হয়ে ওঠার আনন্দ অন্যদিকে অতীতকে পিছু ফিরে দেখার চাহিদা – কবির এই অনুভূতি ছবির মতো উদ্ভাসিত তাঁর ‘ছেলেবেলা’য়। সেখানে জীবনের কোন টানাপোড়েন বা বিচ্ছেদের বেদনা কবিকে স্পর্শ করতে পারেনা। এক নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্য দিয়ে কবি-জীবন বয়ে চলে নদীর স্রোতের মতো। পথ-চল্‌তি যা কিছু সামনে পড়ে সঙ্গী করে নেন তাকে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ কবি এঁকে চলেন তাঁর জীবনকে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে : ইতিহাস, ছদ্ম-ইতিহাস, কল্পনা ও রোমান্সের আখ্যান

চন্দন বারিক

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

‘বেনের মেয়ে’ ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী’র দ্বিতীয় তথা সর্বশেষ উপন্যাস।প্রথম উপন্যাস ‘কাঞ্চনমালা’**(১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়)রচণার প্রায় বত্রিশ বছর পরে** শাস্ত্রী মহাশয় ‘বেনের মেয়ে’ রচনায় হাতদেন। উপন্যাসটি ১৯৭৬ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে রচিত। প্রথমে নারায়ণ মাসিক পত্রে(১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্দে/ইংরেজী ১৯১৭-১৮খ্রীষ্টাব্দ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে।এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে হরপ্রসাদ যে উপন্যাসটি লিখলেন তাঁর মধ্যে পৌঢ় জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর সর্বত্র।কর্মব্যস্ত জীবনের যে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল সেগুলিকে তিনি এই উপন্যাস রচনার কাজে লাগিয়েছেন। ‘কাঞ্চনমালা’য় বঙ্কিমের অনুসরণ ছিল সর্বাপ্রেক্ষা বেশি। ‘বেনের মেয়ে’ সেখান থেকে অনেকটা মুক্ত।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী বিবর্তন হলেও এটি খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বাংলা দেশের বিস্মৃত একটি কাহিনী প্রধানত বাঙ্গালী বনিক-পরিবারের গল্প,যার পশ্চাতে আছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গূঢ়-ইঙ্গিত । উপন্যাসটিকে শাস্ত্রী মহাশয় ঐতিহাসিক বলে দাবীও করেননি। গ্রন্থটির মুখপাত অংশে তিনি বলেছেন ‘বেনের মেয়ে’ ইতিহাস নয়,সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়।কেননা আজ-কালকার বিজ্ঞনসঙ্গত ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয়না । আমাদের রক্তমাংশের শরীর আমরা পাথুরে নই, কখনও হইতেও চাইনা । তবে এতে একালের কথা নাই,সব সেই কালের ,যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল,ঘোড়া ছিল,জাহাজ ছিল ,ব্যবসা ছিল,বানিজ্য ছিল ,শীল্প ছিল কলা ছিল”। ঔপন্যাসিক ‘বেনের মেয়ে’কে ইতিহাস নয় বললেও আমরা জানি ঔপন্যাসের পটভূমি রূপে ইতিহাসের একটা বড় স্থান আছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন আচার আচরণ,বিবর্তন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এই ঔপন্যাসের কাহিনীর মূল কেন্দ্র। আসলে শাস্ত্রী মহশয় ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক ও গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর যে গভীর পাণ্ডীত্য ছিল, সমসাময়িক খুব কম ব্যক্তিই তাঁর সমতুল্য ছিলেন। তাই উপন্যাসে স্বাবাভিক ভাবে এই ধর্মের খুঁটিনাটি দিকগুলি ধরা পড়েছে। হাজার বছর আগে বাংলার অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক,ধর্মীয়, সামাজিক,সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ ছবি ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। যদিও ইতিহাসের কালানুক্রম সঠিক ভাবে ব্যবহার হয়নি। ইতিহাসের তথ্যগুলো ভাসমান বয়ার মতো ইতস্তত বিক্ষপ্ত । আসলে ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ চেয়েছিলেন তথ্যগুলোকে ঐক্য সূত্রে বেঁধে যুক্তি ও উপাদানের সাহায্যে নিরে্ট করে তুলতে। অনেক গুলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম রেখে লেখক তার বিবরনাদির উপর সত্যের ছাপ দিতে চেয়েছিলেন। আসলে তিনি ইতিহাস এবং ছদ্ম-ইতিহাসকে এক যায়গায় মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর অসাধারন শিল্প প্রতিভার সমবায়ে। ড.অসিত বন্দোপাধ্যায় বলেছেন-“ সহজিয়া বৌদ্ধদের ধর্মকর্ম,শীল সদাচার,সাধন প্রণালী তিনি অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক সংঘাতও যথেষ্ট তীব্র হয়েছে,কিন্তু নিজে ঐতিহাসিক হয়েও এ উপন্যাসে নিছক ইতিহাস লিখতে চাননি, ইতিহাস অবলম্বনে রূপকথা লিখতে চেয়েছিলেন;এবং সে বিষয়ে সফল হয়েছিলেন। এতে ইতিহাসের পটভূমিকা থাকলেও ইতিহাসের চেয়ে কল্পনারই আধিক্য। আসলে তিনি গল্প লিখতে চেয়েছিলেন খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।” হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মের গভীর অনুরাগী ছিলেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শণ আবিস্কার করেন। পরবর্তী কালে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা’ গ্রন্থমালার মধ্যে সংকলিত করে প্রকাশ করেন। যা তাঁকে পরবর্তী কালে ‘বেনের মেয়ে’ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে। তা নাহলে তিনি কাঞ্চনমালা’রচনার প্রায় বত্রিশ বছর পরে আবার উপন্যাস রচনায় হাত দেবেন কেন? আসলে রসভোক্তা হরপ্রসাদ যেমনি ইতিহাসের পাথুরে প্রমানের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি তেমনি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় ধর্মীয় সঙ্গীতের গোপন তত্ত্বের দিকেও আকৃষ্ট হননি। এ বিষয়ে তাঁর ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগানও দোহা’ গ্রন্থের ভূমিকা ও ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসের মুখপাত্র অংশে চোখ রাখলে স্পষ্ট বোঝাযায়।

এক) “ধর্ম কথা বুঝিয়া কাজ নাই।আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি,সাহিত্যের কথা কহিব।” (“হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা” গ্রন্থের ভূমিকা)

দুই)- “আজ কালকার বিজ্ঞান সঙ্গত ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমান ভিন্ন ইতিহাস হয়না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর আমরা পাথুরে প্রমান নই। কখনো হইতেও চাইনা । (‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসের মুখপাত্র)

বোঝা যায় লেখক এখানে উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙ্গালীর লুপ্ত ইতিহাস পুর্ণজীবিত করতে উৎসাহী। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি দিয়ে সমৃদ্ধ জন-জীবনের সজীব প্রতিচ্ছবি ‘বেনের মেয়ে’র প্রধান আকর্ষণ; ব্যক্তিগত সুখ-দুখের কাহিনী তার অনুষঙ্গ মাত্র। ‘বেনের মেয়ে’র কাহিনী দীর্ঘ নয় জটিলতো নয়ই। উপন্যাসের কাহিনী শুরু হায়েছে শকাব্দ ৯২২,সংবত১০৫৭ ইসবি, ১০০০ বৎসর, মাস বৈশাখ ,তিথি পূর্ণিমায় সাতগাঁ রাজ্যের গাজন উৎসবকে কেন্দ্রকরে। তারা পুকুরের রূপা বাগদী রূপনারায়ণ সিংহ উপাধী নিয়ে প্রবল প্রতাপে সাতগাঁ শহর ও সপ্তগ্রাম ভুক্তি শাষন করছেন। রাজার এই প্রথম গাজান উৎসব পালন ও মহা-বিহার প্রতিষ্ঠা। এই উৎসবকে কেন্দ্রকরে বিরাট ধূম পড়েগেছে। লুইসিদ্ধা ও তাঁর শিষ্য এসেছেন এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করবেন। গুরু শিষ্য হাতির পিঠে চেপে চলেছেন সমাবেসে। পথে সকলে সম্বর্ধণা জানাচ্ছেন। সাতগাঁয়ের প্রসিদ্ধ বেনে বিহারী দত্ত ও তার পরমাসুন্দরী কন্যা গুরু শিষ্যকে সম্বর্ধণা জানালেন। বিহারী দত্তের বিধবা কন্যা মায়ার মধ্যে শিষ্য বিষন্নতার ছায়া লক্ষ্য করলেন এবং মায়ার রূপে বিহল্য হয়ে পড়লেন।মায়ার সন্তান ছিলনা। তখন বাংলা দেশে হিন্দু বোদ্ধ বিরোধ। বোদ্ধরা মায়াকে মহাবিহারের ভিক্ষুণী করে তার সম্পত্তি হস্তগত করতে চাইলো।গোপনে গোপনে তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো। রাজা রূপনারায়ণ চেষ্টা করলেন মায়াকে লুই সিদ্ধার চেলার সাধন সঙ্গনী করার। বিহারী দত্ত সব বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে সাহায্য চাইলেন ব্রাহ্মণ্য শক্তির কাছে। মস্করীর ছদ্মবেসে পিচাশখণ্ডীর এক ব্রাহ্মণ মায়াকে গোপনে এক অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে গেল। মায়ার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সাতগাঁয়ের শুরু হলো প্রবল অন্দোলন। হিন্দুরা বোদ্ধদের দায়ীকরলে রূপারাজা পড়লেন ঘোর সংকটে। কথাটা হিন্দুরাজা হরিবর্ম দেবের কানে গেল। বিহারী হিন্দু জানতে পেরে তিনি বললেন-“তবেত উহাকে সাহায্য করা অমাদের আবশ্যক। বাগদী রাজা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করিবে আমরা সহ্য করিতে পারিবনা”। উভয় পক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রণসূর, হরিবর্মদেব ও বেনেরা একদিকে; অপর দিকে রূপা রাজা ও মহীপাল। যুদ্ধে হিন্দুদেরই জয়ী হলো। রূপনারায়ণ সিংহ তোরণ চাপাপড়ে মারা গেলেন। মন্ত্রী মেঘা পলায়ন করলেন। মহাবিহারের দায়িত্বে থাকা লুইদিদ্ধার শিষ্য অনেক চেষ্ঠা করার পরেও রাজাকে না বাঁচাতে পেরে শেষে হিন্দুদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বিহারী দত্ত সাত গাঁয়ে প্রধান শক্তি বলে বিবেচিত হলেন। কন্যা মায়াকেও ফিরে পেলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিধান মেনে বিহারী দত্ত দত্তক পুত্র গ্রহন করলেন। কন্যা মায়াও মৃত পতির অলৌকিক আদেশে দত্তক পুত্র গ্রহন করলেন বিধিস্মমত ভাবে। সকল সৈনিক-ই পুরস্কৃত হলো। পিচাশখণ্ডীর ব্রাহ্মণ পুরস্কারের পরিবর্তে একটি রাজসভার শিল্প প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান করার প্রার্থণা জানালেন। রাজা হরিবর্মদেব এতে খুশি হলেন। রাজ সভায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জ্ঞানী গুনী শিল্পীরা সমেবেত হয়ে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিলেন। রাজা হরিবর্মদেব ও উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করলেন শিল্পীদের। রাজ সভার লুইসিদ্ধার শিষ্য ও একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন;যার মধ্যদিয়ে তাঁর মায়ার প্রতি গোপন গভীর অনুরাগ ব্যপ্ত হয়ে গেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণনা করেছেন –“গান থামিল ।বিহারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মায়ার মনে হইল –পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও। সকলেই আশ্চর্ষ হইয়া গেল। সাতগাঁয়ের লোক খুবই বিরক্ত হইলো। এমনটা যে হবে গুরুপুত্রও বুঝেন নাই। তাঁহার পুরস্কার হইলো। তিনি ফিরিলেন। সভার লোক কেহই সাধুবাদ বা জয়ধ্বনি করিলনা। এটতা যে হবে গুরুপুত্র বুঝিতে পারেননাই।” শেষে বিপদ বুঝে লুইসিদ্ধা শিষ্যকে আত্মগোপনের নির্দেষ দিলেন। -এই হলো বেনের মেয়ে উপন্যাসের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রেখালেখ্য ।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানান ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র । গোটা উপন্যাস জুড়ে স্থান পেয়েছে তৎকালিন সমাজের বিভিন্ন চিত্র । মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-“এক হাজার বছর আগের বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বান্দিক সহবস্থানের এই দলিলের পুরোভূমিতে আহার, পরিধেয়,শিল্প লোকাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিন্যাস-অথর্চ তার মধ্য দিয়ে জাতির বৃহত্তর অর্থনৈতিক বানিজ্যিকও রাজনৈতিক তরঙ্গে উত্থান পতনের আভাস পাওয়া যায়। ”

প্রাচীন বাংলা দেশের ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ স্বাবাভিক ভাবে চর্যাপদের ও তার সমকালের বিভিন্ন চিত্র তুলে এনেছেন। চর্যাপদের প্রাচীন পদকার লুইপাদ উপন্যাসের একটি গুরুত্ত্বপূর্ণ চরিত্র।এছাড়াও বৌদ্ধধর্মের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন। উপন্যাসের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে চর্যাগীতির পদপাঠের মধ্যদিয়ে। চর্যাকার ও তাঁদের পদসমুহকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন অসাধারণ নিপুনতায়। গভীর আন্তরিকতায় তিনি চর্যাপদকে আর একবার প্রতিষ্ঠা করলেন ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতির পটভূমিকায়। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন-“ ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনীতিতে নেই,রাজ রাজড়াদের দ্বন্দ্ব সংঘাতে তার একটা আংশের মাত্র পরিচয়,গোটা জাতির জীবনের সামগ্রীক বিবর্তনের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হয়,এ বই তার একটি জীবন্ত নিদর্শণ।” বেনের মেয়ে উপন্যাসে যুদ্ধের পটভূমি রচনা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সাহায্য নিয়েছেন। ‘বেনের মেয়েতে’ রাজা হরিবর্মদেব ও মহীপালের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে দুজন মহীপালের কথা পাওয়া যায়। হরপ্রসাদের উল্লেখিত মহীপাল সম্ভবত দ্বিতীয় মহীপাল হবেন। উপন্যাসে যে হরিবর্মদেবের কথা বলা হয়েছে তিনি দ্বিতীয় মহীপালের সমসাময়িক হতে পারেন। দুইজনই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। রূপা রাজাও বিদ্রোহের ঘটনাটি কতটা ঐতিহাসিক সে বিষয় কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের প্রযোজন। পাল রাজত্বের সময়ে কৈবর্ত বিদ্রোহের সহিত উপন্যাসে বর্ণিত নিন্মবর্গের রাজা রূপাবাগদীর কিছু সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও দুটির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন দুরহ। ভোজ বর্মদেবের তাম্রশাষণ থেকে জানাযায় জাতবার্মা দিব্য ও গোবর্ধণকে পরাজিত করেন। দিব্য কৈবর্ত বিদ্রোহের অধিনায়ক । রামচরিত থেকে জানাযায় দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়্ক দিব্যের বংশধর ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরে জয়লাভ করেন। জাত বর্মার বংশধর হরিবর্মদেব ।দিব্যের বিদ্রোহের সঙ্গে হরিবর্মদেবের কোন সম্বন্ধ নির্ণিত হচ্ছেনা। এছাড়া ইতিহাস থেকে জানাযায় মহীপাল কৈবর্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ছিলেন। কিন্তু উপন্যাসে দেখাযায় রূপা রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মহীপাল। সুতরাং কৈবর্তবিদ্রোহের সঙ্গে রূপারাজার বাগদী বিদ্রোহের কোন মিল নেই । হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণনায় ঐতিহাসিকতা না থাকলেও তিনি কৈবর্তবিদ্রোহের সাদৃশ্যেই বাগদী বিদ্রোহের চিত্রটি এঁকেছেন। সমালোচক বিজিত কুমার দত্ত বলেছেন-“ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অবলম্বনে ‘বেনের মেয়ে’র যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন হরপ্রসাদ ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে । তখানকার দিনে সাধারনণ যোদ্ধা জাতি ছিল ডোমও বাগদী । অনান্যরাও অবশ্য যুদ্ধে যোগ দিতেন । অষ্টাদ্বশ শতাব্দীর ঘনরাম ও মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে এই যুদ্ধের চিত্র আছে। ”

ইতিহাসে উল্লেখিত ভবদেব ভট্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী । সে যুগের কবির প্রশস্তি লীপিতেও ভবদেব ভট্টের নাম পাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শণ চর্যাপদের অন্যতম সিদ্ধাচার্য লুইপাদ একটি অন্যতম ঐতিহাসিক চরিত্র। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি হিসাবে উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছেন। ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ এঁকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে একাদ্বশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ইতিহাসের তথ্যগুলিকে সামান্য রকমফের করে পরিবেষণ করেছেন। লুইসিদ্ধার চরত্রচিত্রনে নিজের কল্পনাশক্তির ওপর বেশি নির্ভর করেছেন ঔপন্যাসিক। ‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে যে মুসলমান আক্রমনের কথা বলা হয়েছে তার ঐতিহাসিকতা পুরোপুরি সঠিক না হলেও লেখক ইতিহাসের অনুগত থেকেছেন। এছাড়া উপন্যাসে যে সব পণ্ডীতদের কথা বর্ণিত হয়েছে এঁদের কালানুক্রমিক বজায় রাখা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি ।এঁরা একই কালে জীবিত ছিলেননা । ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনায় লেখক সর্বদা তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দেননি একথা সত্য, তবে নির্দিষ্ট স্থান কালের বেড়াকে একটু আধটু সরিয়ে নিলে ছবিগুলিকে ঐতিহাসিক বলাযেতে পারে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শণ চর্যাপদের বিভিন্ন প্রষঙ্গ,উপাদান ও চর্যার সমকালিন বিভিন্ন চিত্র উপন্যাসে হরপ্রসাদ ব্যবহার করেছেন। লেখক গল্পবলাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই ডিটেল বর্ণনা ধর্মীতা হরপ্রসাদের রচনার প্রধান গুন। রাজা হরিবর্মদেবের শীল্প প্রদর্শণী সভায় চর্যাপদের কবি লুইসিদ্ধার অংশ গ্রহন ও কবিতা পড়া একটি অন্যতম গুরুত্ত্বপূর্ণ প্রষঙ্গ। সুধু মাত্র লুইসিদ্ধা নন, চর্যাপদের চাটিলপা,সরহপা,এঁরাও অংশ গ্রহন করেছেন। লেখক বর্ণনা করেছেন-“পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম আসিলেন চাটিলপা,-আসিয়া অতি মধুর স্বরে পড়িতে লাগিলেন-

“ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী। দু আন্তেচিখিল মাঝে ণ থাহী।। .................................

সভাসুদ্ধ লোক ধন্যধন্য করিয়া উঠিল। তখন বাণীপাদ আসিয়া মৃদু মধুর স্বরে তালে তালে পড়িলেন-

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী। অনহা দাণ্ডী বাকী কিঅত অবধূতী।। …………………………………………

তিনি বসিয়া পড়িলেন। জয় জয় শব্দে সভাস্থল ভরিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন সরহপাদ। অতি গম্ভীর মূর্তি,উদাস দৃষ্টি, ধীরে ধীরে অতি গম্ভীর স্বরে পড়িলেন-

আপনে রচি রচি ভবনির্বানা।

মিছে লোএ বান্ধাবএ আপণা।”৮

এই ভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের বিভিন্ন কবিদের রচণা ও বিভিন্ন অনুষঙ্গ কে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। তাঁরই হাতে প্রথমে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, সিদ্ধাচার্যদের কাহিনীও সমসাময়িক বিভিন্ন চিত্র নতুন রূপ লাভ করলো। সমালোচক বলেছেন- “ সমকালীন বৌদ্ধধর্মও সাধন পদ্ধতির বিচিত্র রূপ এবং তাঁদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের এত বিস্তৃত গভীর জ্ঞান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো আর কার ছিল? উপন্যাস লেখায় এই পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করেছেন তিনি। ফলে এসেছে অসাধারণ সাফল্য।” এছাড়া উপন্যাসে প্রাচীন ভারতের সমাজের বিভিন্ন ছবি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। বাঙালী বনিকের বহির্বানিজ্য,বিহারীর সমুদ্র,বানিজ্যের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। বিহারী যে শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়,একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ তা সহজেই বোঝা যায়। বিহারীর কন্যা নিখোঁজ হলে দেশব্যপি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, বনিকদের সমর্থন হারানো বৌদ্ধরাজা রূপ নারায়নের পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল। হরিবর্মদেব বনিকদের স্বীকৃতি স্বরূপ বনিক প্রধান বিহারী দত্তকে সাত গাঁয়ের শাষনকর্তা মনোনীত করেন। দেশের অর্থনীতি সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজনীতিতে বনিকদের বিপুল প্রভাব ঔপন্যাসিক যোগ্যতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এছাড়াও ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল মৌলবাদকে। এর পাশাও-পাশি হিন্দু ধর্মের প্রধানদের অনুদার সঙ্কীর্ণতার কথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে পোঁছে দিয়েছেন। হিন্দু ধর্মের প্রধানেরা বনিক বিহারী দাত্তকে চার বর্ণের মধ্যে শূদ্র হিসাবে সমাজে গ্রহন করেছেন। যদিও উপন্যাসে লেখক বিষয়টিকে নিস্পৃহ ভাবে বর্ণনা করেছেন ।এর মধ্যে ঐতিহাসিক বর্ণ প্রথার জটিলতাকে লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে গেছেন ।অপর দিকে বনিকদের শুদ্র হিসেবে গ্রহন করার ফলে তাঁদের কি পতিক্রিয়া হল তাও উপন্যাসে লেখক বর্ণনা দেননি।যদিও বিষয়টির মধ্যে এর ধরনের রাজনৈতিক কুটকৌশল ছিল।রাজা বল্লাল সেন রাজনৈতিক ও ব্যাক্তিগত কারণে তৎকালিন স্মার্ত ব্রাহ্মণদের দিয়ে সুবর্ণ বেনেদের সমাজে পতিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন –“ বল্লাল অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণ বনিকদের শুদ্রের স্তরে নামাইয়া দিলেন; তাঁহাদের পূজা অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিলে ,তাঁহাদের কাছে দান গ্রহন করিলে কিংবা তাঁহাদের শিক্ষাদান করিলে ব্রাহ্মণরাও পতিত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানও দিয়া দিলেন।।” বেনেরা দীর্ঘকাল ধরে সমাজে এমনি ভাবে পতিতই ছিলেন। পরে বঙ্গীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্যানন্দের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষালাভ করে সামাজিক ভাবে পূর্বের স্থান কিছুটা ফিরে পেয়েছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়টিকে উপন্যাসে নিস্পৃহ ভাবে বর্ণনা করেছেন। সঠিক ভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হলে তৎকালীন সমজচিত্র আরো যে স্পষ্ট হতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দুরাজা হরিবর্মদেবের রাজসভায় শীল্প প্রতিযোগীতা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। লেখক সমকালীন পূর্বভারত পরিক্রমা করেছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ,হিন্দুবিদ্যাও সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হওযায় বাংলার সামাজিক ইতিহাস অনেকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়া ঔপন্যসিক একটি গুরুত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে্টি মুসলমানের ভারত আক্রমনের প্রষঙ্গ । রাজা হরিবর্মার উদ্যোগে আযোজিত শিল্পকলা-কাব্য মহাসভায় নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য মস্করী রাজদূত হয়ে পশ্চিম ভারতে ও কাশী মথুরা,ও কনৌজ গিয়ে দেখেন সেখানে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। হিন্দুদের প্রবল শত্রু সীমান্ত হানাদিচ্ছে। শিল্প কলা চর্চার কারোর অবকাশ নেই। ত্রিবেনী সঙ্গমে এসে দেখলেন-“সকলের মুখেই এক কথা;মুসলমান আসিতেছে। সকলেই সাজিতেছে; নিতান্ত কানা, খোঁড়া,আতুর ও বৃদ্ধছাড়া সকলেই সাজিতেছে। জাতি ভেদও মানিতেছেনা ব্রাহ্মণও সাজিতেছে,ক্ষত্রিয়ও সাজিতেছে, বৈশও সাজিতেছে, শুদ্রও সাজিতেছে, পাহাড়ীও সাজিতেছে। শুনিলেন পানওয়ালীরা যা উপায় করিয়াছিল যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল সব দিয়া দিয়াছে। তাহাতে প্রায় এক কোটি টাকা হইয়াছে। কনৌজের পান খুব বিখ্যাত। প্রায় এক হাজার পানওয়ালী ছিলো, তাহারা যথাসর্বস্ব দিয়াছে। রাজ মহিষী বাপের দেওয়া এক জোড়া হীরের বালা মাত্র আইওতের চিহ্ন রাখিয়া বাকী সব গয়না দিয়া দিয়েছেন।রাজা এক বৎসরের রাজস্ব-যাহার নাম রাজার সর্বস্ব,দিয়া দিয়েছেন। ব্যবসাদারেরা ছয় বৎসরের মুনাফা দিয়া দিয়েছেন। শীল্পীরা এক বৎসরের আয় দিয়া দিয়েছে।” মুসলমানের এই আক্রমন গাজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমন। ইতিহাসে পাওয়া যায় গাজনীর মামুদের আক্রমন ঘটেছিল একাদ্বশ শতাব্দীর প্রথম দুই ,তিন দশকের মধ্যে। এছাড়াও উপন্যাসে আরো বহু ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখের চেষ্ঠা আছে। যদিও সেগুলি সর্বদা ইতিহাসের সততার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত নয়। ঔপন্যাসিকের তা কাম্যও ছিলনা।”

‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসের কাহিনী খুব একটা ঘন-পীনদ্ধ একথা বলা যায়না। হয়তো পাঠকের উপন্যাসের প্রতি উদাসীনতার এটি একটি বড় কারণ।কাহিনীটি শিথিল। চরিত্রগুলির উত্থান পতন বিশেষ নেই। বিকাশও দেখানো হয়নি বিশেষ।যার নামে এই উপন্যাস সেই বেনের মেয়ে মায়ার চরিত্র চিত্রনে অনেক জটিলতার সম্ভাবনা থাকার সত্ত্বেও লেখক সে পথে পা বাড়াননি। তিনি মায়াকে নিতান্ত সরল রেখায় চিত্রিত করেছেন। মায়ায় সঙ্গে গুরু শিষ্যের হৃদয়ের টানাপোড়েনকে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করে চরিত্রটিতে বৈচিত্র্য আনা যেত। যদি লেখক এ বিষয়ে একটু বেশী যত্নবান হতেন। সমালোচক ঠিকই বলেছেন-“ মায়ার চরিত্র সরল। তার বৈধব্য, শোককাতরতা স্বামী চিন্তায় একধরনের মোহবিষ্টতা,পোষ্যপুত্রের প্রতি বাৎসল্যে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা, সব মিলে সে এক রাঙা চরিত্র। এমনকি আন্তরিকতাপূর্ণ কাব্য রচনা তাকে কোন নিগূড় তাৎপর্ষ দিতে পারেনি” একেই ভাবে ভবদেব, লুইসিদ্ধার চরিত্রেও কোন বিবর্তন নেই। বিহারী দাত্তের চরিত্র কিছুটা হলেও পাঠকের মনে দাগ কাটে। বনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে বিহারী একটি সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে কিছুটা হলেও উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। বিহারী তার বনিক বৃত্তিতে,বুদ্ধিচাতুর্যে,সংগঠনী শক্তিতে দ্রুত কর্ম তৎপরতায়,প্রবল বাৎসল্যে এবং সুস্থির বিবেচনায় একটি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছে। শেষ বানিজ্য যাত্রার পত্যাবর্তনের পথে সমুদ্রে প্রবল ঝড় দেখাদিলে স্ত্রী কন্যার জীবন রক্ষার্থে বিহারী বহুকষ্টে অর্জিত ধন বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

উপন্যাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল বিবর্তিত চরিত্র লুইসিদ্ধার শিষ্য নবীন। চরিত্রটি পাঠকের মনযোগ আকর্ষণের দাবী করে। প্রথম দর্শনে বিহারীর কন্যা মায় লুইসিদ্ধার শিষ্যের মনে রেখাপাত করে। মায়া বিধিবা জানতে পেরে শিষ্য নবীন ধীরে ধীরে মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যদিও তা এক রৈখিক। মায়া এ বিষায়ে কিছুই জানতে পারেনি। জানলেও মায়া যে ধরনের চরিত্র তাতে তার কোন পরিবর্তন হতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। গুরু শিষ্যও সে কথা উপন্যাসে কোথাও প্রকাশ করেননি। শুধুমাত্র শিল্প সম্মেলনের শেষে তার স্বরচিত কবিতা পাঠে ঈঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

“বহই নাবী মাঝ সমুদরে দুস্পহর বেলা। দারুন পিআসা হিঅ মোর বাধই কণ্ঠ শোষ গেলা।। নিঅহি পানী পিব ন সকই অহ নিসি তিষি বাঁধই।” লেখক বর্ণনা করেছেন –“ এ গানের অর্থ বুঝিতে কাহারও বাকী রহিলোনা। গুরুপুত্র সমুদ্রের মধ্যে নৌকায় ভাসিয়া আছেন। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জল নোনা। জল খাইবার জো নাই। জল দেখিতেছেন তৃষ্ণা বাড়িতেছে। শেষ প্রাণ যায় যায়।, যোগী নির্বান চাহিতেছেন, কিন্তু শক্তি নাই। যাহাকে শক্তি করিতে তিনি চান সে সম্মুখেই আছে। কিন্তু সে ফিরিয়াও চায়না। তাঁহার জীবন বৃথাই যাইতেছে।”১৩ গুরুপুত্রের মায়ার প্রতি আসক্তি, সংযমের চেষ্টা ও যন্ত্রনা কবিতায় প্রকাশিত। গুরুপুত্রের এই হৃদয়বৃত্তির আন্দোলন চরিত্রটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। শেষে অপমানিত গুরুপুত্রকে সাতগাঁ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে লুইপাদের নির্দেশে। চরিত্রটিতে ট্রাজেডির স্পর্শ আছে।

কাহিনীর প্রয়োজানে ঔপন্যাসিক কিছু অলৌকিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টতে সেগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় বাতাবরণ ও অলৌকিক বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এগুলির প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন বাংলার একটি অন্যতম ধর্ম সাধনা হলো তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে মিশে কালচক্রযান ও মন্ত্রযান রূপে দেখা দিয়েছিল, এবং তা জনপ্রিয় হয়েছিলো। বৌদ্ধশাস্ত্রের পণ্ডীত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে অভি্যিত ছিলেন বলেই উপন্যাসে তিনি এর ব্যবহার করেছেন। মস্করীর সাহায্যে মায়া তার মৃত স্বামী জীবনধনীর মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মৃত স্বামীর সঙ্গে কথা বলার মধ্যে আমরা এর পরিচয় পাই। সমালোচক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষেত্র গুপ্ত উভয়েই এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার না করলেও উপন্যাসে এগুলির গুরুত্ত্ব কম নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে ম্যাজিক রিয়ালিজিম বলে যে বিশেষ তত্ত্বের ব্যবহার লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে পাওয়া যায় তার গুরুত্ত্ব সকলে স্বীকার করেন। বিশেষ করে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ‘একশ বছরের নিঃসঙ্গতা’(১৯৮২) উপন্যাসটি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এর প্রতি।জাদু-বাস্তুবতাকে বাংলা সাহিত্যে সমালোচকেরা ‘কুহকি বাস্তবতা’ নামে চিহ্নিত করেছেন । আপাত অবাস্তব অলৌকিক কাহিনী গুলো উপন্যাসের মধ্যে যখন অনায়াসে স্থান পায় তখন সেগুলিকে জাদু বাস্তবতার আখ্যা পায়,এবং তা সমাদৃতও হয়। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিকেরা তাঁদের নিজেদের সমাজের বিশ্বাস-সংস্কার, রিতি-নীতি গুলিকে তাঁদের লেখায় মিশিয়ে দিয়ে একটি অলৌকিক বাতাবরণ গড়ে তুলেছেন । এবং তা সমাদৃত ও হয়েছে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য,বিশ্বাস কে উপন্যাসে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তলার জন্য যদি কিছু অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় নেন তাহলে সেটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবা ঠিক নয় ।

‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো হরপ্রাসাদ শাস্ত্রীর ডিটেল বর্ণনা দেওয়ার ভঙ্গি। তিনি প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরার জন্য প্রায়ই ডিটেল বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। যার ফলে তার মূল কাহিনীর বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে তার খুঁটিনাটি দৃষ্টি ভঙ্গি পাঠকের চোখে এড়িয়ে যায়না।

উপন্যাসের আরম্ভেই রুপা রাজার একমাইল লম্ব গাজনের শোভাযাত্রা- পথের বিচিত্র সজ্জা,ফুলের মালা, সোলা ও অভ্রের তোরন,ধ্বজা ও পতাকা ইত্যাদির বর্ণনা চোখের সামনে দৃশ্যটি ছবির মত ভেসে ওঠে । এছাড়া পুকুরে মাছ ধরার বর্ণনা কথা ভোলা যায়না । এছাড়া প্রাচীন বাংলার ছড়া, সাহিত্য বিশেষ করে চর্যাপদ ও তার বিভিন্ন অনুষঙ্গের ব্যবহার আমাদের জানার পরিধিকে আরো বাড়িয়ে দেয় । রুপা রাজার যুদ্ধের সজ্জার সময় বীর ডোমেদের রণবাদ্য বোঝাতে গিয়ে হরপ্রাসাদ বাংলার বহু প্রচলিত ছড়াকে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক বর্ণনা করেছেন-“দশ হাজার বাগদী সাজিল ,সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডোম ও সাজিল। তাহার আগে গিয়ে রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল,বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল-

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে ঢাল মৃগেল ঘাঘরা বাজে বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া সাড়া গেল বামন পাড়া।

ডোমেদের সাড়া বামন পাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ” এ বর্ণনা রসিক মনের , এখানে ইতিহাসের পাথুরে প্রমান খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হওয়ার ছাড়া উপায় থাকেনা। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ঔপন্যসিক স্কটের সঙ্গে হরপ্রসাসাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্কট যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচণা করার সময় জন-জীবনের প্রচলিত গল্প-গাথা, ছড়া, গানকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন একেই ভাবে শাস্ত্রী মাহাশয়ও ‘বেনের মেয়ে’তে একেই ভাবে জনজীবনের প্রচলিত কাহিনী কিংবদন্তীকে স্থান দিয়েছেন।

রূপকথার আঙ্গীকের ব্যবহার লেখকের সচেতন লিপি কৌশলের উদাহরণ। শুধুমাত্র রূপকথার ব্যবহার নয় কখনো কখনো লেখক কাহিনী গ্রন্থনে কথকতার আশ্রয়ও নিয়েছেন। আসলে লেখক প্রাচীন বাংলার একটি যথার্থ সামাজিক গাল্প লিখতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে সফল হয়েছেন তা আজ আমরা জোরের সঙ্গে বোলতে পারি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহশয়ের ‘বেনের মেয়ে’ রচনার প্রায় শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পথে। উপেক্ষার কালগর্ভ অতিক্রম করে আবার উপন্যাসটিকে ফিরে দেখার সময় বোধ হয় এসেগেছে।

**সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার পঞ্জীঃ**

“বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস”-ক্ষেত্র গুপ্ত । গ্রন্থ নিলয়। “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর”- প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য । বাক প্রতিমা ।“বেনের মেয়ে”-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । নাথ পাবলিশিং । “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত”-অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । মডার্ণ পাবলিশার্স ।“ইতিহাস,কল্পইতিহাস” -মীনাক্ষী চট্যোপাধ্যায় ।থীমা “বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসিক উপন্যাস” – বিজিত কুমার দত্ত । “বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব” – নীহাররঙ্গন রায় । “দশদিশি –চর্যাপদ সংখ্যা । “তথ্যসূত্র”-চর্যাপদ সংখ্যা । “নন্দনী”-চর্যাপদ সংখ্যা । “জগজ্জ্যোতি”-চর্যাপদ সংখ্যা । “জাতিঙ্গা” –চর্যাপদ সংখ্যা ।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মশাল’ নাটকে সাম্প্রদায়িকতা ও শান্তি প্রসঙ্গ

আশিস রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষের হাতে মানুষ খুন, ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত। এ এক অপার বিস্ময়। দাঙ্গার অশুভশক্তি সবকিছুকে যেন বিষাক্ত করে দেয়। বিষিয়ে দেয় পরস্পর ধর্ম বিরোধী মানুষের মধ্যে। ধর্মীয় বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা যেমন সফল হয়েছিল, তা যেন আজও বর্তমান। ‘মশাল’ নাটকেও দাঙ্গার পটভূমি হিসাবে আমরা এটাই দেখবো। ‘কলকাতার পাশ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের বস্তিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য মালিকপক্ষের গোপন ষড়যন্ত্র, সমাজ শত্রুদের প্ররোচনায় ও অপপ্রচারে শ্রমিক-সংহতির মধ্যে ভাঙ্গন এবং অবশেষে পৈশাচিক দাঙ্গার বীভৎসতার সর্বনাশা আত্মক্ষয়ের চরম পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই হল ‘মশাল’ নাটকের মর্মকথা।’১

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ‘মশাল’ নাটকে প্রধান সমস্যা হলেও। অর্থনৈতিক বৈষম্যও বড় ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বিশেষ কোন সম্প্রদায় দাঙ্গায় মেতে ওঠেনি। চটকলের মালিক ও ম্যানেজার জ্যাকশনের উস্কানিতে পটলা, ঘন্টা, রামাকান্তদের মত গুণ্ডাদের দিয়ে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকরা মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মোকাবিলা করতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রমূলে পুঁজিবাদী সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক কারণে বিভক্ত হওয়ায় ভারতের পাটশিল্প সঙ্কটের মুখে পড়ে। চটকল গুলো ছিল পশ্চিমবঙ্গে আর কাঁচামাল আসত পূর্ব পাকিস্থান থেকে। পাকিস্থান সরকার কাঁচামাল বন্ধ করে দিলে চটকল গুলো সমস্যায় পড়ে। এই সুযোগ নিয়ে মিল মালিকরা শ্রমিক ছাঁটাই করতে থাকে আর অন্যদিকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে থাকে এদেশ থেকে। কারখানার মালিকরা ভাবছিল এদেশ থেকে মুসলিম বিতাড়িত করে পূর্বপাকিস্তান সরকারকে চাপ সৃষ্টি করলে তারা আবার কাঁচামাল পাবে। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাটের আন্তর্জাতিক বাজারকে করায়ত্ত করা। আর এখান থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্যবাদী শ্রমিক শ্রেণির লড়াই।

নাটকের প্রধান চরিত্র মতি। বাড়ি পূর্ববঙ্গে। বর্তমানে হাওড়ার অদূরেই একটি কারখানায় কাজ করে। তার বোন ললিতা পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় স্বামী, পুত্র মুসলিমদের হাতে নিহত হওয়ায় সর্বসান্ত হয়ে দাদা মতির কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মতি কারখানার শ্রমিকদের নেতা। মালিক কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইলে, মতি তাঁর সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কারণ সে জানে সাধারণ শ্রমিক দাঙ্গা চায় না। তাই মতির উদ্যোগে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা হয়।

মতি।। (ম্যানেজার) আপনার চিঠি পেলাম সার। কিন্তু সভা আমাদের করতেই হবে।

ম্যানেজার।। করতেই হবে।

মতি।। উপায় নেই। প্রত্যেক মজদুরকে আজ খোলাখুলি জিগ্যেস করতে হবে তারা দাঙ্গা চায় না শান্তি চায়?

ম্যানেজার।। মিল কম্পাউন্ডের বাইরে জিগ্যেস কর।২

মালিক পক্ষ যে শান্তির পক্ষে নয়, তা খুব স্পষ্ট। মালিকশ্রেণির পক্ষে হীরালাল রমাকান্ত তারা গুণ্ডাদল নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে হত্যা করতে থাকে। আতঙ্কে মুসলিমরা পূর্ব পাকিস্থানে যেতে চাইলে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেওয়া হয়। এমনকি অবিচারে হত্যা লীলাও চালানো হয়। এখানে মুসলিম শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে জালালকে। জালাল এর পুত্র জয়নালকে মানুষ করে ললিতা, পুত্রহারা ললিতা জয়নালকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে। গুণ্ডার দল বুঝতে পারে জালালকে হত্যা করা খুব একটা সোজা হবে না। বরং তার পুত্র সন্তানকে হত্যা করতে পারলে; জালাল শোকে পূর্ব পাকিস্থান চলে যাবে। ললিতা জয়নালকে বেশি দিন আগলে রাখতে পারেনি। রমাকান্তের দল জয়নালকে আগুনের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে। মতি শ্রমিকনেতা হওয়ায় নিজের কোন আত্মীক সুখ রাখেনি। সবসময় শ্রমিকদের ভালো চিন্তা করেছে। মুসলিমদের উপর এত অত্যাচার, জয়নাল হত্যা মতিকে যেন বধির করে দিয়েছে সে আর কারো সাথে দেখা করতে চায় না। তাঁর সহযোগী বন্ধুদের উপরও আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। সবটা মিলিয়ে মতি যেন আজ অনেকটা দিশেহারা।

মতি।। (আকষ্মাৎ আবেগ ভরে বলে ওঠে) না না জালাল, তুমি চলে যাও তুমি চলে যাও এখান থেকে... এদের কাছে তুমি থেকো না, চলে যাও... চলে যাও... এদের তুমি বিশ্বাস করো না... না না এদের তুমি বিশ্বাস করো না।৩

মতির এই উদাসীনাতায় শ্রমিক আন্দোলনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। এই সময় হীরালাল আর রমাকান্তের দল আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। সাধারণ শ্রমিকরা আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মতির জন্য বসে না থেকে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য শোভনলাল, জালালরা আবার সংগঠিত করে শ্রমিকদের। আন্দোলনের প্রথম সারিতে শোভনলাল থাকায় রমাকান্তের গুলিতে শোভনলালকে প্রাণ দিতে হয়। মতি ভুল বুঝতে পারে, সে আবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সকলকে নিয়ে।

শঙ্কর।। এসো মতি, শোভনলালকে ছুঁয়ে আমরা সবাই শপথ করি যারা ঘর পোড়ায়, মায়ের কোল শূন্য করে, মানুষের বুকে ছুরি মারে, গুলী চালায়- স্বার্থের জন্য গরীবের তাজা রক্তে হাত রাঙায়- সেই রক্ত শোষা দুষমনদের বিরুদ্ধে হবে আমদের শেষ লড়াই। বলো- শহীদ শোভনলাল কি... ৪

শ্রমিকদের ঐক্যের মধ্যে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। শোভনলালের মৃত্যুতে তা আবার ঐক্যবদ্ধ আকার ধারণ করল। একদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অন্যদিকে শ্রমিক ঐক্য মানবজীবনে জ্বেলে দিয়েছে মহামিলনের ‘মশাল’। যুগান্তরের পথে অগ্রসর হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ মশালের আলোয়।‘ভারত-বিভাগের পর সমগ্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ ছাড়াইয়াছে তাহারই সর্বনাশা-রূপটিকে স্পষ্টতর করিবার জন্য কয়েকজন দরদী শ্রমিক’, দু-একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক, তাহাদের আশ্রিত গুণ্ডার দল, বিশ্বাসহন্তা দালাল, বিভ্রান্ত শ্রমিক এবং একটি মাত্র সর্বরিক্ত বাছিয়া লইয়াছেন লেখক।’ দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ঘটেছে যেন তারই প্রতিফলন।

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র দেখালেন অশুভশক্তির ভয়ে কখনো পিছিয়ে যেতে নেই বরং সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে এই অশুভশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তা পিছু হটতে বাধ্য। অন্ধকারে দূরীভূত করতে গেলে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কেননা আমাদের সকলের জানা রাতের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে আলোর স্পর্শ পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি। ‘মশাল’ সেই আলোর শক্তি।

Sports and Pastime পত্রিকায় মশাল সম্পর্কে লেখা হয়- ‘Masal means ‘The Torch.’ The drama offers a solution to the disturbances which take place from time to upset our life.’৫ আলোকে কখনো বদ্ধ করে রাখা যায় না। সে তার নিজের মতো করে মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। অন্ধকারে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হয় রুখে দাঁড়াবার জন্য। সমালোচকের কথাতেই শেষ করতে হয়- ‘মশাল তাই পাক-ভারত সমস্যাকেই শুধু আলোকিত করবে না,... ‘মশাল’ জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যারও নাটক।’

তথ্যসূত্র-

১। গণনাট্য; পৌষ, ১৩৬৯।

২। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মশাল, কলকাতা, পুস্তকালয়, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা-৩৮।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা-৮২।

৪। ঐ, পৃষ্ঠা-৮৭।

৫। Sport & Pastime, Dec.13, 1952.

**Tibetan Buddhists and the environmental movement**

**Dr.Malvika Ranjan**

Associate Professor

Dept of History, BHU.

**“Tibetan Buddhism**  “ is defined by Illustrated Encyclopedia of Buddhism as “ the name by which The West knows the new Buddhist tradition that emerged in India in the 7th century CE, and which by the end of the Ist millennium, was flourishing in Tibet and surrounding regions.1 . It was the third major tradition which emerged from the Mahayana in the 7th century CE. It was first called Tantrayana or Tantric Buddhism, because many of its beliefs and practices were based on scriptures called tantras. 2

The four major orders of Tibetan Buddhism which emerged were - the Gelug, Sakya, Kagyu, and Nyingma. 3. Today,the Tibetan Buddhists are forging ahead in propagating the message of environmental peace .Amongst them His Holiness The Dalai lama, 17th Karmapa Lama and Gwalang Drupka are Buddhist leaders are making commendable contributions in the field of environmental protection. The Dalai Lama and Gwalang Drupka belong to the Gelug sect whereas Karmapa Lama comes from the Kagyu sect of Tibetan Buddhism.4

In the Assisi Conference on Religion and environmentalismin 1986 , ‘The Buddhist Declaration of Nature’ was presented bya Tibetan Buddhist monk-Venerable Lungrig Namgyal Rinpoche, Abbot of Gyuto Tantric University . He highlighted the ecological significance of the theory of cause and effect, and ‘Ahimsa’.

He observed-

|  |
| --- |
| “In the words of the Buddha Himself:Because the cause was there the consequences followed; because the cause is there, the effects will follow". These few words present the interrelationship between cause (karma), and its effects. It goes a step further and shows that happiness and suffering do not simply come about by chance or irrelevant causes. There is a natural relationship between a cause and its resulting consequences in the physical world. In the life of the sentient beings too, including animals, there is a similar relationship of positive causes bringing about happiness and negative actions causing negative consequences. 5 |

In the present times, it is His Holiness , the 14th the Dalai Lama who has been recognised the world over as one of the most revered and respected spiritual teachers. Amongst the various honours bestowed upon him, lies the prestigious Ramon Magsaysay awarded to him in the year1959 and the Nobel Peace Prize in 1989 . He has championed the cause of Tibet , and has religiously engaged himself in spreading the message of peace , harmony and environmental protection. .Dalai Lama . believes that a negative mind would not only be negative towards human beings but also towards other living beings . He opined- “ If a person is full of hatred , anger and fear, then peace is simply lip service . Genuine peace must come from within. Therefore , in order to achieve genuine happiness or world peace, first we must start with our individual selves, in our minds, in our emotional worlds. We must aim for tranquillity and calm. Of course , disturbances, hatred, anger, and too much suspicion are bound to happen, but these should only be at the superficial level. Deep inside , we must respect all forms of sentient beings and know our future depends on them . Combine these two and deep inside you can sustain peace and inner calmness. With a deep compassionate mind and wisdom, you can maintain inner peace.”6

Dalai Lama has been enthusiastically involved in the field of environmental awareness. In the year 2007 ,His Holiness the Dalai Lama released his collected statements made on the environment on different occasions from 1986 to 2006 where he expressed his concern for environmental crises. On The World environment Day on June5, 1986, he said-

“Exploration of outer space takes place at the same time as the earth’s own oceans, seas, and freshwater areas grow increasingly polluted, and their life forms are largely unknown or misunderstood .Many of the earth’s habitats, animals, plants, insects, and even micro-organisms that we know of as rare or endangered, may not be known at all by future generations. We have the capacity, and the responsibility. We must act before it is too late.7

The Dalai Lama emphasised on the relevance of Ahimsa or Non violence . He stated-“As a boy studying Buddhism, I was taught the importance of a caring attitude toward the environment. Our practice of non-violence applies not just to human beings but to all sentient beings – any living thing that has a mind. Where there is a mind, there are feelings such as pain, pleasure, and joy. No sentient being wants pain: all wants happiness instead. I believe that all sentient beings share those feelings at some basic level” 7

Making his observations on the importance of tree plantation and protection, Dalai Lama said-

“I have remarked on several occasions about the importance of tree planting both in India, our current home, and in Tibet as well. Today, as a symbolic gesture we are having a tree planting ceremony here in the settlement. Fortunately, the movement towards a deeper commitment to environmental protection through planting new trees and taking care of the existing ones, is rapidly increasing all over the world. At the global level, trees and forests are closely linked with weather patterns and also the maintenance of a crucial balance in nature. Hence, the task of environment protection is a universal responsibility of all of us. I think that is extremely important for the Tibetans living in the settlements to not only take a keen interest in the cause of environmental protection, but also to implement this ideal in action by planting new trees. In this way, we will be making an important gesture to the world in demonstrating our global concern and at the same time making our own little but significant, contribution to the cause”.8  Dalai Lama ‘s contribution has been well recognised in India and abroad and many environmentalists, political leaders, and celebrities have joined hands with him.

Equally important role in creating Environmntal awareness goes to 17th Karmapa Lama. In 2008, His Holiness The Karmapa Lama brought forth the Environmental Guidelines for Kagyu Monasteries, Centres and Community. On doing so, he said "this booklet is but a small drop in a huge ocean. The challenge of environmental degradation is far more complex and extensive than anything we alone can tackle. However, if we can all contribute a single drop of clean water, those drops will accumulate into a fresh pond, then a clear stream and eventually a vast pure ocean. This is my aspiration." 9

. In 2009, Karmapa Lama established an organisation by the name of Khoryug. This an organisation is now forging ahead in the field of environmental protection . KHORYUG in Tibetan language means environment. It is a network of Buddhist monasteries and centres in the Himalayas jointly working  on environmental protection of the Himalayan region with the mission of practically applying the values of compassion and interdependence towards the Earth and all living beings . The aim of KHORYUG is to develop a partnership with community based organizations and NGOs wherever there is a member monastery or centre with a coordinated this organisation can achieve it purpose of protecting life on earth. 10

Karmapa lama’s work-‘The Heart Is Noble –Changing the world from inside out’ published in 2013 addresses the most important issues of times, such as the environmental crisis, food justice and gender issues, arguing that each and every citizen of the world has a role to play in creating a better future for us all. The book has been tremendously supported by Environmentalist Vandana Shiva 11

His Holiness the Gyalwang Drukpa is yet another prominent Tibetan whose is propagating the message of environmental cleanliness and protection by organising ‘ padyatras’ . In November 2014, he organised an 800 km ‘Padyatra ‘ across Uttar Pradesh and Bihar to promote cleanliness and environment preservation among people. . In a unique initiative, he and his followers picked up garbage and plastic wastes along the way and disposed them. This was the seventh ‘Eco padyatra’ since 2006 to promote cleanliness and environment preservation. Regarding this kind of initiative, Gwalang said- “I love to walk during these pilgrimages. Once in a while I arrange Padyatra meaning foot journey.On these foot journeys, we spend a few weeks walking through mountains and valleys together. Often we pick up plastic bottles and other garbage along the way and visit remote villages that get to rarely get to see outsiders. 12

Earlier in 2010, the Gyalwang Drukpa targeted to plant one million trees in Ladakh, as part of the ‘one million trees’ campaign initiated by Wangari Maathaï, recipient of the Nobel Peace Prize in 2004. . In October 2012, over 9,800 volunteers planted nearly 100,000 trees, safeguarding villages from mudslides and cleaning polluted air.13

Not far behind Tibetan Buddhists are followers of other Buddhist streams such as Zen and Nichiren Buddhism who along with the Tibetan Buddhists are engaged in serving the society and the environment. Their work is being well recognised by the masses as well as the government.

References-

1.Ian Harris,(consultant editor), 2007, ‘The Illustrated Encyclopedia of Buddhism,London-Lorenz Books, Pg 102.

2.Ibid

3.Newman Bruce, 2004, ‘A Beginner’s Guide to Tibetan Buddhism, New York-Snow Lion publishers, Introduction.

4.Ibid

5.Op

6 .Singh Renuka,(ed),2013, ‘Boundless As The Sky-His Holiness The Dalai Lama-Speeches on Happiness, Compassion and Love’,Ananda:Penguin, Pg88.

7 ‘ His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment, Collected Statements’ ,2007, Published by Environment and Development Desk Department of Information and International Relations (DIIR) Central Tibetan Administration Dharamsala,Pg1

8 His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment, Collected Statements’ ,2007, Published by Environment and Development Desk Department of Information and International Relations (DIIR) Central Tibetan Administration Dharamsala ,Pg20-22,

9.Retrievedfrom<http://kagyumonlam.org/Download/TEXT/English%20Archana.pdf>

10. Retrieved from ,< <http://www.khoryug.com/vision/>>

. 11 Retrived from <http://www.shambhala.com/the-heart-is-noble.html>

12. His Holiness Gwalang Drupka,2012, ‘Everyday Enlightenment’, United Kingdom Penguin Introduction,

13 Re trieved from <http://times of india.indiatimes.com.>

**HUNGERS IN BHABANI BHATTACHARYA’S NOVEL ‘SO MANY HUNGERS’**

**Amit Kumar De**

Reaserch scholar

F.M. University,Ballasore.

Bhabani Bhattacharya is one of the outstanding Indo-English Novelist.Begining his literary career with translations of Tagore’s short stories, he went on to produce such literary masterpieces as *‘So Many Hungers!, Music for Mohini, He who Rides a Tiger,A Goddess Named Gold, Shadow From Ladakh* *and A Dream in Hawaii*. He has earned worldwide distinction and his books have appeared in twenty six languages. He has won the Coveted Sahitya Akademy Award for 1967 for his latest novel ‘Shadow From Ladakh’ which is a deserved honour to receive the award for a work in English.

Bhattacharya loves deep involvement in life. A strong sense of social purpose drives him to write. He hates to create art for art’s sake. After Independence the novelist were free from the moral obligation of voicing the political aspiration of the people in throwing away the foreign Yoke and achieving national freedom and turned their attention to the internal problems of India. Bhabani Bhattacharya and Kamala Markandaya are the finest exponent of this new type of novels. Dr. C.Paul Verghese notes “Food is the primary requisite of human dignity, hunger de bases and dehumanities man.”

Bhabani Bhattacharya’s So Many Hungers! He who rides a Tiger’ and Kamala Markandya’s Nectar in A Sieve and A Handful of Rice are representative pieces of this new type of novels. The novels of hunger and theme have imparted to the Indo-Anglian novel a sharp awareness of the basic predicament of Indian masses both rural and urban.

Bhattacharya was a stern realist. His novel ‘so Many Hungers!’ is an offspring of his emotionally disturbed self in the hunger striken society. A socio-political novel, ‘So Many Hungers!’ potrays the unflinching faith of the individuals in human values even in the teeth of all miseries and privations. There are indeed so many hungers-hunger for food , hunger for affection, hunger for love,hunger for lust, hunger for money,hunger for name and fame and hunger for sacrifice and hunger the general welfare for all.

‘So Many Hungers!’ deals with the theme of exploitation, political, economic and social. It depicted all those for political freedom –in the case of India, political expansion in the case of axis powers,for money in the case of capitalists who create an artificial food scarcity by hoarding for food in the case of starved Bengal.His novels are novels of Ideas.Lila Roy writes:”as we read his writings, we hear the dialogue between men and ideas he lives by.”

The novel opens with a rich familys rejoicing over the birth of the baby girl in a family and ends with the same father’s getting into prison house in the wake of his seditious action while doing her manitarian works in the war ravaged 1940’s India.Alogside is placed a poor family in striking contrast. The rich would say “It is your job to feed your Government,not Government’s job to feed you”.The fate of the Indian farmer whose life is crushed under the wheels of grinding poverty is drawn with breadth of vision, that we hardly come across anywhere.While Samarendra and Lakshminath and their like were making money faster and faster, Samarendra’s son,Rahul tried to engage in relief work and his other son Kunal entered the Army. Devesh is his other parental grandfather .He is a retired teacher presently occupied in training the youth of country to conduct satyagraha for the liberty of their country. The picture of Devesh’s daughter, a poor woman as her husband is a pauper. Devesh’s daughter is a woman of motherly grace. Much of her life is not spent for himself but for her kindred,the neighours and the other suffering folk. Throughout the narration ,she remembers us Gorki’s Mother.Khanu is another character recollecting us the Kargil martyrs. Onu is his younger brother,a symbol of innocent Indian peasant who lives a life of hard work.His simple life is a brilliant example and helpful to others.

Kajoli is a character who embodies the liberation says. A lovely character, Kajoli is unlettered but wise, a rustic girl yet elegant and a country dame yet patriotic. Her life is a hymn .Kajoli is the very incarnation of the true womanhood of India.She is tested by adversity. She has a legacy of manners as old as India and she is indeed the ‘tri-colour flag’. Kajoli and other members of her family crushed under the feet of two mighty monsters-the Japanese war in the East and the inhuman rice-famine created by unprincipled capitalists like Abalabandhu and Samarendra-

“While ten million peasant groaned in hunger,the rice they had raised with their toil moved according to plan out of Bengal.”

Kajoli’s mother loves Kishore because Kishore is wellfed.Lack of food forces Kishore to leave village and unfortunately he leaves he meets a tragic end. Kajoli leaves for Kolkata. They do not find even roots for eating. Kajoli finds a kindhearted soldier who seduces her though she is pregnant.Such is hunger. Like Hardy’s Tess she remains one of the classic heroines of Indian literature.

However a process of contrast is introduced in characterisation. Rahul and Kunal serve as a good contrast of their reaction to war.The mother of Basu family provides a keen contrast to Kajoli’s mother of the peasant family.Again Manju and Kajoli belonging to the two different grades of social status have their own individual place.

The novel deals with the destiny of a whole populace and not that of an individual while the hunger for food is depicted among the villagers of Baruni,Kajoli hungers for love .While the soldier who enjoys Kajoli’s hungers for lust, Kajoli’s hunger for a home remains unfulfilled dream. Abala Bandhu and Samarendra are opitome of hunger for money. Rahul’s involvement in the discovery of science and Kunal’s in the war can be cited as their hunger for name and fame.Devesh’s hunger is for the general welfare of the entire humanity, the cow Mangala stands for the supreme hunger for sacrifice.The word ‘Hunger’ is very often used as a refrain in all his novels. Bhattacharya’s references to the twin hunger for food and for freedom is the key to theme of the novel.Bhattacharya makes a penetrating analysis of the humanity at large and says that the rich folk have poor memories but the poor people never desist from the path of the right, a midst all troubles and frustrations of life. Even woman also do it. Kajoli’s act of pronam to the flag inspires many and even Deveta appreciates it: “Kajoli, you made your pronam to the flag; you are a fighter.”

Bhattacharya is an observer of men and matters and he reveals himself to be a true admirer of Gandhi and Nehru. He does not have any party linkings. The novelist is highly critical of the British administration and its attitude towards the people and the problems of land. The novel unfold the story of man made hunger that took a foil of men, women and children and Bengal. While the hoarders, profitteers and backeteers plied a thundering trade, authority was apathetic, the wells of human pity seemed to have almost dried up, and only the jackals and the vultures were in vigorous and jubilant action.

“ ………vultures perched on the trees, vultures wheeled or hung poised in the sunlight air……………… .

Corpses lay by the road, huddled together. picked to the bones, with eyeless caverns of sockets, bits of skin and flesh rorting on nose and chin and ribs, the skull picked open, only the hairs uneaten….”

The theme of hunger of foods interwines the theme of hunger of freedom. The two themes of the novels are an artistic embodiment of Bhabani Bhattacharya’s affirmative vision of life.

Bhattacharya borrows Gandhi’s vision of an ideal state (Ram Rajya) for his literary works.In ‘So Many Hungers’ he portrays an integration between the aesthetic joy of Tagore and moral discipline of Gandhi.. Among Western writers he was inspired by Leo Tolstoy, Bernard Shaw and Henrik Isen . Among American writers Doss Passos, John Steinbeck, Sinclare Lewis influenced him. He borrowed the art of social realism from them. In So Many Hungers he exposes and attacks the social evils of contemporary society around the major fictional personal like Deveta, Samarendra, Rahul, Kajoli, Kunal, Mother, Monju and Onu. Kunal’s disapperence in W.War-II, Rahul’s arrest, Kajoli’s decision to sell herself, and her mother’s rerolve to end her life-all lead to the crisis which is ultimately diffused so as to percolate to a happy ending of the novel.

The theme of hungers runs through the novels of Anand and Kamala Markandyaya. Anand’s novel ‘Coolies’ and ‘Untouchable’ deal with the human degradation caused by hunger and misery of the poor and their struggle for better life. Kamala Markandaya’s novels ‘Nectar in a Sieve’ and “A Handful of Rice”are novels on the same theme of poverty and hunger. But in Bhattacharya’s ‘So Many Hungers’ we move with the characters, we live with them, we feel their impulses and our souls are touched with the chords of humanity.

Referrences:-

1. K.R. Srinivasa Iyenger: Indian writing in English.

2. Dr. B. Symalarao: Bhabani Bhattacharya and his works.

3. Monika Gupta: The novels of Bhabani Bhattacharya.

4. Ram Sewak Singh: Bhabani Bhattacharya, A Novelist of Dreamy Wisdom.

-